অক্টোবর ২০২২ ▪ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৯

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস

প্রবীণ নারী: মানবসভ্যতা বিকাশের বাতিঘর

মিতব্যয়িতার মূল্যবোধ

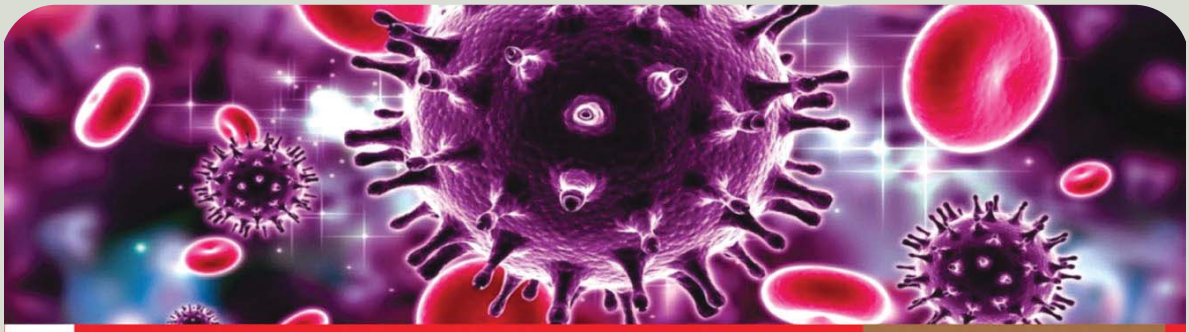

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- হঠাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

অক্টোবর ২০২২ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২২ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সাথে সাক্ষাৎ করেন– পিআইডি

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২২ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে একটি উত্তম ভবিষ্যৎ তৈরির পথে এগিয়ে যেতে বিশ্বনেতৃবৃন্দের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, পাল্টা নিষেধাজ্ঞার মতো বৈরীপন্থা কখনও কোনো জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না বলে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। আলাপ-আলোচনাই সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোত্তম উপায় বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের এ অধিবেশন এমন একসময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন, সহিংসতা ও সংঘাত, কোভিড-১৯ মহামারির মতো একাধিক জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রতিকূলতায় পৃথিবী জর্জরিত। আড়াই বছর পর বিশ্ব যখন করোনাভাইরাস মহামারির বিধ্বংসী প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার হতে শুরু করল তখন রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত বিশ্বকে বড়ো অনিশ্চয়তায় নিমজ্জিত করেছে। তিনি সংকটের মুহূর্তে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি যে জাতিসংঘ, সে বিষয়টি প্রমাণ করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘ (ইউএন) এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। বর্তমান যুদ্ধাবস্থা, বিপর্যস্ত বৈশ্বিক অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, তা থেকে উত্তরণের দিকনির্দেশনাও তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রীর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণটি *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যায় ছাপানো হলো।

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শেখ রাসেল ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরাজিত ও দেশি-বিদেশি শক্তির ষড়যন্ত্রে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এসময় বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলও শহিদ হন। শেখ রাসেল দিবস জাতীয়ভাবে পালিত হয়। এ দিবসকে উপলক্ষ করে রয়েছে প্রবন্ধ ও কবিতা।

১লা অক্টোবর আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। প্রবীণদের সুরক্ষা এবং অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি বার্ধক্যের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে এ দিবসটি পালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ।

৩১শে অক্টোবর বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস। মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হওয়ার আহ্বানে এ দিবসটি পালন করা হয়। এ দিনে ব্যক্তি, পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণে সবাইকে মিতব্যয়ী হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। মিতব্যয়িতার গুরুত্ব নিয়ে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

এ সংখ্যায় বিশ্ব খাদ্য দিবস, জাতিসংঘ দিবস, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে রয়েছে বিশেষ নিবন্ধ। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য বিষয়ের নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ। আশা করি, সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
ইসরাত জাহান

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
e-mail : dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

সূচিপত্র

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

চিরকিশোর শেখ রাসেল ৮
প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

প্রবীণ নারী: মানবসভ্যতা বিকাশের বাতিঘর ১০
প্রফেসর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান

শেখ রাসেল: আলোর পথের অভিযাত্রী ১৪
প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস

মিতব্যয়িতার মূল্যবোধ ১৬
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

শামসুর রাহমান: বাংলা কবিতার সার্বভৌম কবি ১৮
ড. শিহাব শাহরিয়ার

একুশ শতকের সাক্ষরতা ভাবনা ২২
মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

অপচয়কৃত খাদ্যের সঠিক ব্যবহার: সমস্যা থেকে সম্ভাবনা ২৩
ড. মো. খুরশিদুল জাহিদ

শিশু উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদান ২৫
রহিম আব্দুর রহিম

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ ২৭
কে সি বি তপু

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ৩০
ফারিহা হোসেন

মৎস্য চাষে অগ্রগতি ৩৩
ডা. নূরল হক

শারদীয় দুর্গাপূজা ৩৪
সাবিত্রী রানী

পরিবেশ রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ জরুরি ৩৬
সৈয়দা অনন্যা রহমান

বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে সাফল্য ও সম্ভাবনা ৩৯
হুসাইন মামুন

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে চাই সচেতনতা ৪০
ফাইজা ইসলাম

আর্থসামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ নারী ৪১
সাবিহা শিমুল

গল্প

অবিসংবাদিত নেতা ৪৫
জসীম আল ফাহিম

বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা রাতে ৫১
মুহাম্মদ ইসমাঈল

কবিতাগুচ্ছ **৪৩-৪৪, ৪৯-৫০, ৫২**

রাজিয়া রহমান, নাজমুল হুসাইন বিদ্যুৎ, লিলি হক বেগম শামসুন নাহার, আবুল হোসেন আজাদ সাঈদ তপু, কমল চৌধুরী, অমিত কুমার কুণ্ডু ইউনুছ আলী, আবীর আহাম্মদ উল্যাহ, মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ্, আশানূর আইরিন আশা, বাদল ঘোষ, অতনু তিয়াস, কামাল হোসাইন, রতন চন্দ্র পাল ভৌমিক, রকিবুল ইসলাম, আলম শামস মো. মাজহারুল হক

ছড়াগুচ্ছ **৫৩**

জোবায়ের জুবেল, আমিনা খাতুন দিপা, জিশান মাহমুদ, শাহরিয়ার শাহাদাত, মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৫৪
প্রধানমন্ত্রী ৫৪
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ৫৫
শিক্ষা ৫৬
উন্নয়ন ৫৭
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫৮
অর্থনীতি ৫৮
নারী ৫৯
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৯
কৃষি ৬০
পরিবেশ ও জলবায়ু ৬০
যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক ৬১
চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি ৬১
ক্রীড়া ৬২

শ্রদ্ধাঞ্জলি:

চলে গেলেন ভাষাসৈনিক ও সাংবাদিক রণেশ মৈত্র ৬৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail : dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
১৬৪ ডিআইটি এক্স. রোড, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০
e-mail : md_jwell@yahoo.com

হাইলাইটস

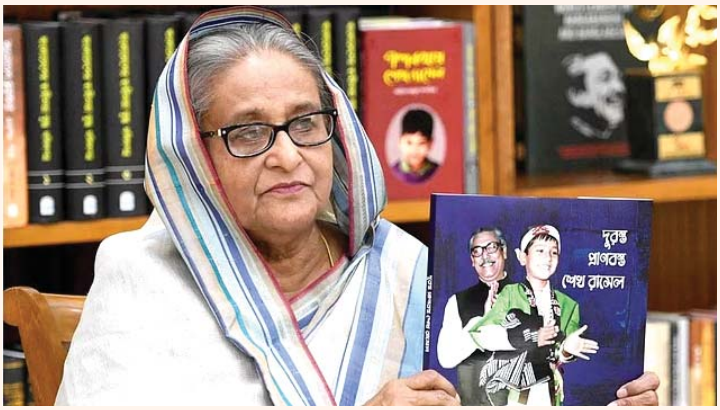

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র প্রান্তে 'শেখ রাসেল দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'দুরন্ত প্রাণবন্ত শেখ রাসেল' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন– পিআইডি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

আলাপ-আলোচনাই সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোত্তম উপায়। আমাদের প্রমাণ করতে হবে– সংকটের মুহূর্তে বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো জাতিসংঘ। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে সংকট সমাধান তুলে ধরার সাথে সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পৃথিবী প্রতিষ্ঠার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি দেখুন পৃ. ৪

১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস

১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় লেখক খ্যাতিমান দার্শনিক ও নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে পরিবারের এই নতুন সদস্যের নাম রাখেন 'রাসেল'। এই নামকরণে মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। রাসেল ছিলেন পরিবারের সবার অতি আদরের। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সপরিবার শহিদ হন। শেখ রাসেলও এদিন নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। ১৮ই অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস। শেখ রাসেলকে নিয়ে প্রবন্ধ 'চিরকিশোর শেখ রাসেল' এবং 'শেখ রাসেল: আলোর পথের অভিযাত্রী' দেখুন যথাক্রমে পৃ. ৮ ও ১৪

প্রবীণ নারী: মানবসভ্যতা বিকাশের বাতিঘর

মানবসন্তানের বিকাশ আর সাফল্যের পেছনে ব্যক্তির মা বা নারীর অনন্য প্রতিপালন, সক্ষমতা, আশ্রয়দান, সহিষ্ণুতা এবং স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে কৃতকার্যের শিখরে পৌঁছানোর অনবদ্য তাগিদ ও প্রেরণা জোগানের ন্যূনতম কোনো জুড়ি মেলা ভার। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আলোকিত প্রবীণ নারীর সক্ষমতা, বলিষ্ঠতা, দক্ষতা, সহনশীলতা, সৃজনশীলতা এবং কীর্তি ও অবদানের এক উপযুক্ত এবং অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতেই হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈশ্বিক এবং পারিবারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সফল এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ। বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবীণ নারী দেশের বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের সক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস উপলক্ষে 'প্রবীণ নারী: মানবসভ্যতা বিকাশের বাতিঘর' শীর্ষক নিবন্ধ দেখুন পৃ. ১০

মিতব্যয়িতার মূল্যবোধ

৩১শে অক্টোবর বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস। এ দিনে ব্যক্তি, পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কল্যাণে সবাইকে মিতব্যয়ী হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। সকল ধর্মে মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় মিতব্যয়ী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এ চর্চা আমাদের ও উত্তরসূরিদের সুরক্ষা করবে। 'মিতব্যয়িতার মূল্যবোধ' শীর্ষক নিবন্ধটি দেখুন পৃ. ১৬

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২২ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে ভাষণ দেন– পিআইডি

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

[২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২২]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মাননীয় সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ণ।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশ্বাস দিচ্ছি, সাধারণ পরিষদের পুরো অধিবেশনজুড়েই আমার প্রতিনিধি দল আপনাকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিয়ে যাবে। একইসঙ্গে আপনার পূর্বসূরি জনাব আবদুল্লাহ শহীদকেও অভিনন্দন জানাই। জাতিসংঘ মহাসচিব জনাব আন্তোনিও গুতেরেসকে আমি সাধুবাদ জানাই জাতিসংঘকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও প্রাণবন্ত করে তোলার লক্ষ্যে তাঁর দৃঢ় প্রতিশ্রুতির জন্য।

এ বছরের সাধারণ বিতর্কের প্রতিপাদ্য– 'একটি সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ: আন্তঃসংযুক্ত প্রতিকূলতাসমূহের রূপান্তরমূলক সমাধান।' জলবায়ু পরিবর্তন, সহিংসতা ও সংঘাত, কোভিড-১৯ মহামারির মতো একাধিক জটিল এবং বহুমাত্রিক প্রতিকূলতায় পৃথিবী নামক আমাদের এই গ্রহ আজ জর্জরিত। এবারের প্রতিপাদ্যটি এ সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলায় এবং আমাদের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করে শান্তিপূর্ণ ও টেকসই পৃথিবী গড়ে তোলার উপায় খুঁজে বের করার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ আকাঙ্ক্ষার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের এখনই সম্মিলিত উদ্যোগ নিতে হবে।

জনাব সভাপতি,

যুদ্ধ বা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, পালটা নিষেধাজ্ঞার মতো বৈরীপন্থা কখনও কোনো জাতির মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাই সংকট ও বিরোধ নিষ্পত্তির সর্বোত্তম উপায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে 'গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ' গঠন করায় জাতিসংঘের মহাসচিবকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এই গ্রুপের একজন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে, আমি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব ও সংকটের গভীরতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বৈশ্বিক সমাধান নিরূপণ করতে অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে– 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়'। বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিপাদ্য-উদ্ভূত জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে আসছে। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর এই মহান পরিষদে তিনি তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, কোট 'শান্তির প্রতি যে আমাদের পূর্ণ আনুগত্য তা এই উপলব্ধি থেকে জন্মেছে যে, একমাত্র শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই আমরা আমাদের কষ্টার্জিত জাতীয় স্বাধীনতার ফল আস্বাদন করতে পারব এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অশিক্ষা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য আমাদের সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়োগ করতে সক্ষম হবো।

সুতরাং আমরা স্বাগত জানাই সেই সকল প্রচেষ্টাকে, যার লক্ষ্য বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা সীমিত করা, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাসহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি স্থানে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতি জোরদার করা।' আনকোট।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য এখনও সমভাবে প্রাসঙ্গিক। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্বাস করতেন যে, শান্তি হলো বিশ্বের সকল নারী-পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব প্রতিরূপ। যুদ্ধের ফলে মানবজাতি, বিশেষ করে শিশু ও নারীরা চরম কষ্ট ভোগ করে। কত মানুষ রিফিউজি হয়ে পড়ে।

সভাপতি মহোদয়,

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারির শুরু থেকে এ সংকট মোকাবিলায় আমরা মূলত তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে কৌশল নির্ধারণ করেছি।

প্রথমত, মহামারি সংক্রমণ ও বিস্তার রোধ করতে আমরা জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রসারিত করেছি; দ্বিতীয়ত, আমাদের অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে কৌশলগত আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেছি; এবং তৃতীয়ত, আমরা জনগণের জীবিকা সুরক্ষিত রেখেছি। এসব উদ্যোগ মহামারিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করার পাশাপাশি মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সাহায্য করেছে।

মহামারি থেকে আমাদের নিরাপদ উত্তরণের মূল চাবিকাঠি হলো টিকা। এই টিকা সরবরাহের জন্য আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও এর কোভ্যাক্স ব্যবস্থা এবং আমাদের সহযোগী দেশগুলোকে ধন্যবাদ জানাই। ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে টিকা পাওয়ার যোগ্য শতভাগ মানুষকে আমরা টিকা দিয়েছি।

জনাব সভাপতি,

একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তিপূর্ণ সমাজ এবং সামাজিক সম্প্রীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে অন্যতম।

জিডিপির হিসাবে আমাদের অবস্থান ৪১তম। বিগত এক দশকে আমরা দারিদ্র্যের হার ৪১ শতাংশ থেকে ২০.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় মাত্র এক দশকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২,৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের পূর্বে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৮ দশমিক এক পাঁচ শতাংশ। এর আগে আমরা টানা তিন বছর ৭ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। মহামারি চলাকালেও ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ৬ দশমিক নয় চার শতাংশ হারে প্রসারিত হয়েছে।

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পালটা নিষেধাজ্ঞার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত এবং জ্বালানি, খাদ্যসহ নানা ভোগ্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে আমাদের মতো অর্থনীতি মারাত্মক চাপের মুখে পড়েছে। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছি।

২০২৬ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে রূপান্তরিত করার জন্য এবং ২১০০ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু সহিষ্ণু বদ্বীপে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

সভাপতি মহোদয়,

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, মা ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। গত এক দশকে সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমরা তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছি।

আমাদের শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২১ জনে এবং প্রতি লাখ জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যু হার ১৭৩ জনে নেমে এসেছে। মানুষের গড় আয়ু এখন ৭৩ বছরের অধিক।

আমরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি যাতে সমাজের কেউ পিছিয়ে না থাকে। স্বামী পরিত্যক্তা নারী, বিধবা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তৃতীয় লিঙ্গ এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭০ লাখ মানুষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকৃত হচ্ছেন।

উন্নত ভৌত অবকাঠামো মজবুত অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এজন্য আমরা নদীর তলদেশের টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেমসহ টেকসই বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ করছি। আমাদের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত 'পদ্মা বহুমুখী সেতু'। এটি বাংলাদেশের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করবে এবং আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে। এই সেতু জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ১ দশমিক দুই-তিন শতাংশ হারে অবদান রাখবে।

জনাব সভাপতি,

মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড়ো হুমকি হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। জলবায়ু নিয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া আর ভাঙার একটি দুষ্টচক্র আমরা অতীতে দেখেছি। আমাদের এখনই এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের সঙ্গে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অসংখ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি থাকাকালে আমরা 'মুজিব ক্লাইমেট প্রস্পারিটি প্ল্যান' গ্রহণ করি, যার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে 'ঝুঁকির পথ থেকে জলবায়ু সহনশীলতা ও জলবায়ু সমৃদ্ধির টেকসই পথের' দিকে নিয়ে যাওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কিত আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা এবং নীতিগুলো জেন্ডার সংবেদনশীল করে তৈরি করা হয়েছে।

ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য দেশগুলোকে তাদের নিজস্ব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করতে আমরা প্রস্তুত আছি। অন্তর্ভুক্তিমূলক জলবায়ু কার্যক্রমের প্রসারের জন্য আমি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানাই।

সভাপতি মহোদয়,

অভিবাসীরা এখনও তাদের অভিবাসন যাত্রায় অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন। তারা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে আমাদের অবশ্যই বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং সংহতি বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে 'গ্লোবাল কমপ্যাক্ট অন মাইগ্রেশন' এবং এর 'অগ্রগতি ঘোষণা' আমাদের এ বিষয়ে একটি চমৎকার রোডম্যাপ দিয়েছে।

বর্তমানে এসব জটিল বৈশ্বিক সংকট অনেক উন্নয়নশীল দেশের বিগত কয়েক দশকের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে স্থবির করে দিচ্ছে। এই মুহূর্তে ২০৩০-এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা তাদের অনেকের কাছেই একটি অধরা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং কৃষিসহ মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্ট সহায়তা প্রয়োজন। এখন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

আমরা দেখছি, কীভাবে নিত্যনতুন প্রযুক্তি বিশ্বকে দ্রুত পরিবর্তন করে ফেলছে। এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারে সকলের ন্যায্য এবং সমান সুযোগ পাওয়া অপরিহার্য। ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত বিভাজন অবশ্যই দূর করতে হবে।

বাংলাদেশসহ ১৬টি দেশ এখন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে

উন্নীত হওয়ার পথে। তবে ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সংকট আমাদের টেকসই উত্তরণের পথে গুরুতর প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছে। আমাদের উন্নয়নের অংশীজনদের কাছে বর্ধিত এবং কার্যকর সহযোগিতার আহ্বান জানাই। এ বিষয়ে দোহা কর্মসূচিকে আমরা স্বাগত জানাই।

জনাব সভাপতি,

প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পর সুনীল অর্থনীতি বাংলাদেশের উন্নয়নের নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।

আমরা আর্থসামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীজনদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘের কনভেনশনের বিধানগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

এ বিষয়ে যে-কোনো দুর্বলতা উত্তরণের জন্য ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার এবং জাতীয় এখতিয়ারের বাইরের অঞ্চলে সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক আইন যা 'বি বি এন জে' নামে পরিচিত, সেটি প্রণয়নে আরও তৎপর হওয়ার জন্য সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানাই।

সভাপতি মহোদয়,

পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধসহ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ২০১৯ সালে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ বিষয়ক ঐতিহাসিক চুক্তি অনুস্বাক্ষর করি।

আমরা ধারাবাহিকভাবে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে আমাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করে আসছি। আমাদের শান্তিকেন্দ্রিক পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সৈন্য ও পুলিশ প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে আমরা বর্তমানে শীর্ষে অবস্থান করছি।

শান্তিরক্ষাসহ জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান, নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই সমাজ গঠন করতে এ সকল অঞ্চলের জনগণকে তারা সাহায্য করে যাচ্ছেন। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের অনেক শান্তিরক্ষী নিহত হয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণগুলোর সমাধান ব্যতীত টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমরা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বহুমাত্রিক অংশীজনদের একসঙ্গে কাজ করার একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। নারী, শিশু, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডাকে আরও শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও সহিংস উগ্রপন্থার বিষয়ে আমরা 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনোরূপ সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা জনগণের ক্ষতি হয় এমন কোনো কর্মকাণ্ড সংঘটিত হতে দেই না।

এছাড়া সাইবার অপরাধ এবং সাইবার সহিংসতা মোকাবিলা করার লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক চুক্তি প্রণয়নে একসঙ্গে কাজ করার জন্য আমি সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানাই।

জনাব সভাপতি,

একটি দায়িত্বশীল সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে, বাংলাদেশ তার জনগণের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটি সামগ্রিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা অবলম্বন করেছি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় অধিকার ও কল্যাণ সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনি বিধিবিধান প্রণয়ন করেছি।

দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বিনামূল্যে আবাসন প্রদানের লক্ষ্যে 'আশ্রয়ণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন করছি। ১৯৯৭ সাল থেকে আমার নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে বিগত ১৮ বছরে প্রায় ৩৫ লাখেরও বেশি মানুষের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সভাপতি মহোদয়,

অধিকৃত ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। ১৯৬৭ সালের পূর্বের সীমান্তের ভিত্তিতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান ও রাজধানী হিসেবে পূর্ব জেরুজালেমকে নির্ধারণ করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতি বাংলাদেশের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি।

জনাব সভাপতি,

আমি এখন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দিকে। গত মাসে ২০১৭ সালে স্বদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে তাদের গণহারে বাংলাদেশে প্রবেশের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে নিরাপদে ও মর্যাদার সঙ্গে প্রত্যাবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরিতে দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সত্ত্বেও একজন রোহিঙ্গাকেও তাদের মাতৃভূমিতে ফেরত পাঠানো যায়নি। মিয়ানমারে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সশস্ত্র সংঘাত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনকে আরও দুরূহ করে তুলেছে। আশা করি, এ বিষয়ে জাতিসংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের দীর্ঘায়িত উপস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতি, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। তাদের প্রত্যাবাসনের অনিশ্চয়তা সর্বস্তরে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি করেছে। মানব পাচার ও মাদক চোরাচালানসহ আন্তঃসীমান্ত অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমনকি এ পরিস্থিতি উগ্রবাদকেও ইন্ধন দিতে পারে। এ সংকট প্রলম্বিত হতে থাকলে তা এই উপমহাদেশসহ বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।

জনাব সভাপতি,

কোভিড-১৯ মহামারি হতে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো শিক্ষণীয় বিষয় হলো– 'যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই নিরাপদ নয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউই নিরাপদ নয়'। এই অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘসহ আমাদের অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাস্তবিক ও অত্যাবশ্যক সংস্কার করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপর্যয়

মোকাবিলার জন্য আরও কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়।

আমরা দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমন, সংঘাত প্রতিরোধ এবং আর্থিক, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের মতো বৈশ্বিক প্রতিকূলতাগুলোর রূপান্তরমূলক সমাধান খুঁজতে আগ্রহী। তবে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা ব্যতীত আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমরা ইউক্রেন ও রাশিয়ার সংঘাতের অবসান চাই। নিষেধাজ্ঞা, পালটা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে একটি দেশকে শাস্তি দিতে গিয়ে নারী, শিশুসহ গোটা মানবজাতিকেই শাস্তি দেওয়া হয়। এর প্রভাব কেবল একটি দেশেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং সকল মানুষের জীবন-জীবিকা মহাসংকটে পতিত হয়। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। বিশেষ করে, শিশুরাই বেশি কষ্ট ভোগ করে। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বিশ্ব বিবেকের কাছে আমার আবেদন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ, স্যাংশন বন্ধ করুন। শিশুকে খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা দিন। শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন।

আমরা দেখতে চাই, একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব– যেখানে থাকবে বর্ধিত সহযোগিতা, সংহতি, পারস্পরিক সমৃদ্ধি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। আমাদের একটি মাত্র পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই গ্রহকে আরও সুন্দর করে রেখে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব।

জনাব সভাপতি,

এখন আমি এক নিদারুণ ট্র্যাজেডির কথা বলব।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট আমার পিতা, জাতির পিতা, বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একইসঙ্গে আমার মা ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার ছোটো তিন ভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ও তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী সুলতানা কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী পারভিন রোজী, আমার দশ বছরের ছোটো ভাই শেখ রাসেলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আমার চাচা মুক্তিযোদ্ধা শেখ আবু নাসের, ফুফা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর কন্যা ১৩ বছরের বেবী সেরনিয়াবাত, ১০ বছরের আরিফ সেরনিয়াবাত এবং ৪ বছরের সুকান্ত, আমার ফুফাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, ব্রিগেডিয়ার জামিল, পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমানসহ ঘাতকেরা ১৮ জন মানুষকে হত্যা করে। আমি তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

১৯৭৫ সালে ১৫ই আগস্ট জার্মানিতে ছিলাম বলে আমার ছোটো বোন শেখ রেহানা ও আমি বেঁচে যাই। ৬ বছর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে থাকতে হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করে। দুই লাখ মা-বোনের উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

১৯৭১ সালে আমার পিতাকে গ্রেপ্তার করার পর পাকিস্তানের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকায় আমার মা, দুই ছোটোভাই শেখ রাসেল ও শেখ জামাল, ছোটোবোন শেখ রেহানা ও আমাকে গ্রেপ্তার করে একটি একতলা স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে রাখে। আমার প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় ঐ বন্দিখানায় জন্মগ্রহণ করে। আমাদের ঘরে কোনো ফার্নিচার দেওয়া হয়নি। সুচিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। দৈনন্দিন খাবার পাওয়াও ছিল অনিশ্চিত।

কাজেই যুদ্ধের ভয়াবহতা, হত্যা-ক্যু-সংঘাতে মানুষের যে কষ্ট-দুঃখ-দুর্দশা হয়, ভুক্তভোগী হিসেবে আমি তা উপলব্ধি করতে পারি। তাই যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই; মানবকল্যাণ চাই। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি চাই। আগামী প্রজন্মের জন্য শান্তিময় বিশ্ব, উন্নত-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করতে চাই। আমার আকুল আবেদন, যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করুন। সমুন্নত হোক মানবিক মূল্যবোধ।

আসুন, সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা একটি উত্তম ভবিষ্যৎ তৈরির পথে এগিয়ে যাই। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*'র ল্যাটিন আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশ

মেক্সিকান-স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। মেক্সিকোর পার্লামেন্ট ভবনের নিম্নকক্ষে মেক্সিকো-বাংলাদেশ সংসদীয় ফ্রেন্ডশিপ দলের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*র ল্যাটিন আমেরিকান সংস্করণটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদতবার্ষিকী পালনের অংশ হিসেবে বইটির ল্যাটিন আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশ করেছে মেক্সিকোর বাংলাদেশ দূতাবাস। সংস্করণটি মেক্সিকোর স্থানীয় বইয়ের দোকানের পাশাপাশি ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। স্থানীয় সময় ৩০শে আগস্ট মেক্সিকোর পার্লামেন্ট ভবনের নিম্নকক্ষে মেক্সিকো-বাংলাদেশ সংসদীয় ফ্রেন্ডশিপ দলের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে ল্যাটিন আমেরিকান সংস্করণটি উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মেক্সিকো-বাংলাদেশ সংসদীয় মৈত্রী দলের সভাপতি এবং মেক্সিকোর পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের ফেডারেল ডেপুটি রোজালিন্ডা ডোমিঙ্গেজ ফ্লোরেস বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যকার সংহতি আরও বাড়িয়ে তুলতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

বিশেষ অতিথি ফেডারেল ডেপুটি হোসে মিগেল ডে লা ক্রুজ আশা প্রকাশ করেন, এই ল্যাটিন আমেরিকান সংস্করণের মাধ্যমে মেক্সিকোর তরুণ রাজনীতিবিদরা বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

মেক্সিকোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এশিয়া প্যাসিফিক বিভাগের মহাপরিচালক ফার্নান্দো গঞ্জালেস সাইফে বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীর মেক্সিকান-স্প্যানিশ সংস্করণ প্রকাশের জন্য দূতাবাসের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে নতুন গতির সঞ্চার করবে বলে তিনি মত দেন।

প্রতিবেদন: অমিত কুমার

চিরকিশোর শেখ রাসেল

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেল (১৯৬৪-১৯৭৫) বেঁচে থাকলে এখন তার বয়স হতো আটান্ন বছর। কিন্তু পঁচাত্তরের ঘাতকচক্র তা হতে দেয়নি। পনেরোই আগস্টের ভয়ংকর সেই কালরাতে ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুসহ পরিবারের সকলকে হত্যা করেছে—হত্যা করেছে ১০ বছরের শিশু শেখ রাসেলকেও। অথচ রাসেল তো বাঁচতে চেয়েছিল। বাঁচার জন্য ঘাতকদের কাছে আকুতি জানিয়েছিল, বলেছিল পরম আশ্রয় মায়ের কাছে যাবার কথা। মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ঘাতকেরা তাকে হত্যা করেছে নির্মমভাবে।

পঁচাত্তরের ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুর গোটা পরিবারকে হত্যা করেছে মূলত বাংলাদেশকে হত্যা করার জন্য। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে হত্যা করাই ছিল খুনিচক্রের মূল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তারা পনেরোই আগস্টের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। পৃথিবীতে বহু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, কিন্তু সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। খুনিচক্র জানত পরিবারের একজন সদস্যও বেঁচে থাকলে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই তাদের নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি পায়নি অন্তঃসত্ত্বা নারী, মুক্তি পায়নি ১০ বছরের শিশু রাসেল। সেদিন বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে না থেকে যদি ধানমন্ডির বাড়িতে থাকতেন, তাহলে আজ বাংলাদেশের অবস্থা কেমন থাকত তা কল্পনাও করা যায় না।

শেখ রাসেলের মাঝে বঙ্গবন্ধুর সব গুণেরই পূর্বাভাস পরিলক্ষিত হয়েছিল। রাসেলের জ্বলজ্বলে সুতীক্ষ্ণ চোখ দুটোই বলে দেয় ওই শিশুর মাঝে ছিল ভিন্ন কিছু, আজ বেঁচে থাকলে সে ভিন্নতা বাঙালি জাতি সম্যক অনুধাবন করতে পারত। এটা বুঝেই ঘাতকচক্র তাকে হত্যা করেছে, হত্যা করেছে আরেক শিশু সুকান্ত বাবুকেও। বঙ্গবন্ধু পছন্দ করতেন প্রিন্স কোট। বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিব ছেলের আবদার বুঝে রাসেলের জন্যও তৈরি করে দেন প্রিন্স কোট। রাসেলের ছিল উদার হৃদয়, ছিল দূরদর্শিতা, ছিল পরোপকারের মানসিকতা। রাসেল পছন্দ করত কবুতর, বাড়ির কবুতরগুলোকে আদর করত, খাবার দিত। অন্যেরা কবুতরের মাংস খেলেও রাসেল কখনো খায়নি। কারণ, রাসেল বলত কবুতর শান্তির প্রতীক। ১০ বছরের শিশুর চেতনায় এ ধারণা সৃষ্টি হয় কীভাবে? সৃষ্টি হয়, কারণ তার ধমনিতে ছিল বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রক্ত। প্রসঙ্গত বড়ো বোন শেখ হাসিনার লেখা একটা অনুষঙ্গের কথা এখানে উদ্ধৃত করা যায়। শেখ হাসিনা লিখেছেন:

> চলাফেরায় বেশ সাবধানী কিন্তু সাহসী ছিল। সহসা কোনো কিছুতে ভয় পেত না। কালো কালো বড় পিঁপড়া দেখলে ধরতে যেত। একদিন একটা বড় ওলা (বড় কালো পিঁপড়া) ধরে ফেলল আর সাথে সাথে কামড় খেল। ছোট্ট আঙুল কেটে রক্ত বের হলো। সাথে সাথে ওষুধ দেওয়া হলো। আঙুলটা ফুলে গেছে। তারপর থেকে আর পিঁপড়া ধরতে যেত না। কিন্তু ওই পিঁপড়ার একটা নাম নিজেই দিয়ে দিল। কামড় খাওয়ার পর থেকেই কালো বড় পিঁপড়া দেখলেই বলত 'ভুট্টো'। নিজে থেকেই নামটা দিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর মতোই ছিল রাসেলের উদার হৃদয়, ছিল মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু যেমন নিজের জামাকাপড় অন্যকে দিয়ে দিতেন, টুঙ্গিপাড়া গেলে একই কাজ করত রাসেল। খেলার সাথিদের জামাকাপড় কী অন্য কোনো প্রয়োজনীয় জিনিস দিত রাসেল। ছেলের এই পরোপকারী প্রবণতার কথা বুঝতে পেরে টুঙ্গিপাড়া যাবার সময় মা-ও বেশি করে জামাকাপড় কিনে নিয়ে যেতেন, যাতে ছেলে ইচ্ছামতো তা বন্ধুদের দিতে পারে। মায়ের উৎসাহে অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেত রাসেলের, যা তাকে অনন্য করে তুলেছিল।

অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিল রাসেল, অসাধারণ ছিল তার জ্ঞান-বাসনা। বঙ্গবন্ধু তাকে নিয়ে সভা-সমিতিতে যেতেন, জাপান ভ্রমণের সময় তাকে করেছেন সফরসঙ্গী। রাসেলের কথাবার্তা, আচার-আচরণে সর্বদাই পরিলক্ষিত হতো আভিজাত্য, অথচ তার পা থাকত সবসময় মাটিতে। একেবারে পিতার যোগ্য উত্তরাধিকার যেন। শিশু রাসেলের মধ্যে এতসব গুণের খবর নিশ্চয় পৌঁছেছিল ঘাতকচক্রের কাছে। তাই রাসেলকে বেঁচে থাকাটা কিছুতেই তারা নিরাপদ মনে করেনি। রাসেলের বড়ো বোন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাসেলকে কেন হত্যা করা হলো সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন রাসেলকে নিয়ে লেখা তাঁর *আমাদের ছোট রাসেল সোনা* বইতে। ভাইকে নিয়ে লেখা বইটা শেখ হাসিনা শেষ করেছেন এইভাবে:

> ১৯৭৫ সালের পনেরো আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিল ছোট্ট রাসেলকে। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচা সবার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল রাসেলকে। ওর ছোট্ট বুকটা কি তখন ব্যথায় কষ্টে বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ-আদরে হেসে-খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল– কী কষ্টই-না ও পেয়েছিল– কেন কেন ঘাতকরা আমার রাসেলকে এত কষ্ট দিয়ে কেড়ে নিল? আমি কি কোনোদিন এই কেনর উত্তর পাব?

এ প্রশ্ন আসলে ছোটো ভাইয়ের প্রতি বড়ো বোনের আবেগ আর ভালোবাসার প্রতীক। শিশু হত্যাকারীরা যে অপরাধ করেছে, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য তাদের শাস্তি দিতে হবে– বিচার কমিশন স্থাপন করতে হবে। শিশু হত্যাকারীদের বিচারের আওতায় এনে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মকাণ্ড করতে কেউ সাহস না পায়। তাহলে শিশু রাসেলের আত্মা অন্তত কিছুটা শান্তি পাবে।

শেখ রাসেলের রক্ত বাংলার পবিত্র মাটিকে আরও পবিত্র করেছে। যে শিশু রক্ত দেখলে চোখ বন্ধ করত, সেই শিশুই নিজের রক্ত দিয়ে বাংলাকে পবিত্র করে গেল। প্রসঙ্গত স্মরণে আসে শেখ রাসেলের বোন শেখ রেহানার কথা। তিনি লিখেছেন: 'ভাবতেই আমার কষ্ট লাগে যে, আজ রাসেল নেই। রাসেলকে আর দেখতে পাব না। রেহানা আপু বলে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে না। কী অপরাধ ছিল তার? মাত্র ১০ বছরের পবিত্র এক শিশু ছিল। রাজনীতি কী, ও কি বুঝত? রক্ত দেখলে চোখ বন্ধ করে ফেলত। গোলাগুলির শব্দ শুনলে মাকে জড়িয়ে ধরত, বুকের ভেতর কষ্ট চেপে রাখত, সেই রাসেল সবার রক্ত দেখে দেখে তারপর নিজের রক্ত দিয়ে গেল। এই রক্তাক্ত দৃশ্য সে কেমন করে সহ্য করেছিল?'

শেখ রাসেল আজ আর আমাদের মাঝে নেই– কিন্তু আছে তার স্মৃতি। ওই স্মৃতি বুকে ধারণ করে আছে লক্ষ লক্ষ শিশু। এই শিশুদের রাসেলের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। রাসেলের বয়স কোনোদিন বাড়বে না– ও চিরকাল ১০ বছরেরই থাকবে। এমন এক উজ্জ্বল শিশুর সত্তা বুকে ধারণ করে বাংলাদেশের শিশুরা বড়ো হোক– খুনিদের তারা ঘৃণা করুক– বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে তারা এগিয়ে আসুক। শিশু হত্যাকারীদের ক্ষমা করবে না– এমন সংকল্প ঘোষণা করুক বাংলাদেশের শিশুরা। শেখ রাসেল একটি চেতনার নাম– এই চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, এই চেতনা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের চেতনা। রাসেল লক্ষ-কোটি বাঙালি শিশুর চেতনার বাতিঘর। এই বাতিঘরের আলো দেখে আমাদের শিশুরা হয়ে উঠুক লক্ষ-কোটি নতুন রাসেল– এগিয়ে যাক তারা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ার মহাসংগ্রামে।

প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ: লেখক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ

প্রবীণ নারী

মানবসভ্যতা বিকাশের বাতিঘর

প্রফেসর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান

জাতিসংঘের আহ্বানে ১লা অক্টোবর বিশ্বজুড়ে যথাবিহিত মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস। বাংলাদেশেও এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। জাতিসংঘ এবছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে– 'Resilience of Older Persons in a Changing World' অর্থাৎ পরিবর্তিত বিশ্বে প্রবীণদের সহনশীলতা। আবার জাতিসংঘের নিউইয়র্ক কমেমরেশন এই দিবসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে The Resilience and Contribution of Older Women-এর প্রতি। স্লোগানটির খানিক তর্জমা করে বলা হয়েছে যে, জীবনব্যাপী প্রাকৃতিক, পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য আর বঞ্চনার শিকার এই প্রবীণ নারীকুলের সক্ষমতা, সহিষ্ণুতা, কীর্তি আর অবদান স্বীকার করতেই হবে; নতুবা আমরা নিজেরাই যেন অস্তিত্বহীন-অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। এই লক্ষ্যে বিশ্বজুড়ে নাগরিকদের বয়স এবং লিঙ্গভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ এবং এর মানোন্নয়নের প্রতি সকলের সচেতনতা এবং আগ্রহ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি-পরিকল্পনাসমূহে প্রবীণ নারীর বিষয়টি জোরদারভাবে সংশ্লিষ্ট করায় সকল জাতিরাষ্ট্র, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং সুশীল সমাজকে যৌক্তিকভাবে সক্রিয় হতে হবে। প্রবীণ নারীকে সমাজ-সংসারে যেখানে ঠিক মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হয় না, সেখানে অনেক পরে হলেও জাতিসংঘ তার আহূত এই দিবসের প্রতিপাদ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রবীণ নারীদের কথা সসম্মানে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উল্লেখ করেছে বিধায় বিশ্বসংস্থাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এবারের প্রতিপাদ্যটি এমনি এক স্মারক কথা, বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রবীণ নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আর অবদানের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যা তারা দৃঢ়সংকল্প আর সহনশীলতার সঙ্গে সম্পন্ন করে যাচ্ছেন। ১৯৯০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১লা অক্টোবর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (সিদ্ধান্ত নং-৪৫/১০৬)। দিবসটি উদ্‌যাপনের মাহাত্ম্য হচ্ছে– বার্ধক্য এবং প্রবীণ বিষয়ে গণমানুষের নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তন এবং ভুল ধারণা দূর করার লাগসই পদক্ষেপ গ্রহণে এবং প্রবীণজনদেরকে তাদের সুপ্ত কর্মশক্তি এবং সামর্থ্য বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করাতে বিশ্বের জাতিরাষ্ট্রসমূহকে সক্রিয় করে তোলা।

আপনার জীবনের সাফল্যে কোন ব্যক্তির একক অবদান সবচেয়ে বেশি? প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে প্রশ্নটি করা হলে প্রায় সকলেরই উত্তর হবে– তার মায়ের; শতকরায় যা আবার ৭০/৮০ ভাগের উপরে! মানব সন্তানের বিকাশ আর সাফল্যের পেছনে ব্যক্তির মা বা নারীর অনন্য প্রতিপালন, সক্ষমতা, আশ্রয়দান, সহিষ্ণুতা এবং স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে কৃতকার্যের শিখরে পৌঁছানোর অনবদ্য তাগিদ ও প্রেরণা জোগানের ন্যূনতম কোনো জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু সবচেয়ে বেদনাবিধুর বাস্তবতা হচ্ছে, সমাজ-সংসারে নারীই হচ্ছেন সর্বপ্রকারের পারিবারিক ও আর্থসামাজিক বৈষম্য, সম্পত্তিগত বঞ্চনা, বয়স-শারীরিক, যৌন-মানসিক অত্যাচার, নিপীড়ন ও নিষ্পেষণ, চাতুর্য ও প্রতারণা ইত্যাদির নিষ্ঠুর শিকার! জন্মের পর থেকেই তার যে যন্ত্রণার শুরু, বার্ধক্যে পৌঁছে বিভিন্নমাত্রায় তা এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। আশ্চর্য, প্রকৃতিও তার কোনো পর্যায়ে তাকে কোনো ছাড় দেয় না। বস্তুত নারী তার পুরুষ প্রতিপক্ষের বিবেচনায় সকল পর্যায়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত হন, বৈষম্য-বঞ্চনার শিকার হন এবং শেষ বয়সে এসে সম্পূর্ণ নিঃস্ব এবং অসহায়ত্বের আবর্তে নিমজ্জিত হন। শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, যুব, প্রৌঢ় এবং বার্ধক্যের প্রতি স্তরে নারীর বিপরীতে পুরুষ সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়, লাভ করে বাড়তি সুবিধা। প্রকৃতিগতভাবে পুরুষের তুলনায় নারী বেশিদিন বাঁচেন। অধিকাংশ প্রবীণ নারীকে বিধবা হয়েই বেশ কিছু বছর ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকতে হয়। সমাজে বিধবা প্রবীণার মতো অবহেলিত, বিচ্ছিন্ন, গুরুত্বহীন, অসহায় এবং শারীরিক-মানসিক-সামাজিক নানান সমস্যায় জর্জরিত মানুষ বোধ করি আর কেউ নেই। লিঙ্গ, বয়স, শারীরিক দুর্বলতা, রোগব্যাধি ও প্রতিবন্ধকতা, অর্থনৈতিক চরম অসচ্ছলতা এবং পারিবারিক-সামাজিক অযত্ন-অবজ্ঞা-অবিচার প্রবীণাকে মৃত্যু অবধি নিষ্পেষণ করতে থাকে। কেবল নিয়তি আর স্রষ্টার ওপর ভরসা রেখে এবং অনর্গল অশ্রু বিসর্জন করে এরা শতকষ্ট ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন, 'নারীর বল/চোখের জল'।

শক্তি নিয়ন্ত্রিত প্রকৃতি, পুরুষ শাসিত সমাজ অথবা নারী আবর্তিত সংসারের সর্বপর্যায়েই নারী বৈষম্য আর প্রতারণার খপ্পরে কালাতিপাত করতে বাধ্য হন। নারীর এই দুঃখদুর্দশার তাল-মাত্রা কোনো পুরুষের পক্ষে তিলমাত্র অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কবি বলেছেন, 'কী যাতনা বিষে/ বুঝিবে সে কিসে/ কভু আশীবিষে দংশিনে যারে!' রাগে-ক্ষোভে অন্য এক কবি বলেছেন, 'বনমালী তুমি/ পরজনমে হইয়ো রাধা!' নারীর জবানীতে কবি আকাশ

চক্রবর্তী লিখেছেন, 'জন্মের আগে মৃত্যু দিয়েছে/ জন্মের পরে ভয়/সকাল বিকাল শরীর আগলে/লুকিয়ে বাঁচতে হয়।' অর্থাৎ, বিপদ-আপদ আর নিরাপত্তাহীনতাই যেন নারীর জীবনব্যাপী এক অপচ্ছায়া! তবে শত আঘাত, নির্যাতন, অত্যাচার, বঞ্চনা, বৈষম্য আর প্রতিকূলতাকে খানিকটা নিয়তি বিবেচনা করে নারীরা তাদের সহজাত সক্ষমতা, সহনশীলতা, সহ্য ও সৃজনীশক্তি এবং উদারতা দিয়ে মানব উন্নয়নের গতিপথ সচল রাখেন। নারীর জীবন সামগ্রিক; তাই প্রবীণ নারী মাত্রই সাংসারিক, সামাজিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে সুদীর্ঘ দিনের অবদান-প্রতিদান মানবজাতিকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে– একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না। তবুও প্রবীণ নারীর ঋণ পরিশোধ এবং অধিকারজাত প্রাপ্য সেবাযত্ন প্রদানে আমরা চরম অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে যাচ্ছি। অফুরন্ত ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে; যাঁর নেতৃত্বে প্রচলিত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচিতেই কেবল প্রবীণ নারীর হিস্যা এবং মর্যাদা সমুন্নত রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে জাতিসংঘ প্রধানত প্রবীণজনের পক্ষে সকল জাতিরাষ্ট্রসমূহকে পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে; যদিও প্রবীণ নারীর জন্যে এখানেও বলিষ্ঠ কোনো কর্মসূচি লক্ষ করা যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'হেল্প এইজ ইন্টারন্যাশনাল' বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এবং প্রবীণ নারীর মঙ্গল বিধানে এদেরই সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচি চলমান আছে।

মানুষের অন্যতম প্রধান চাহিদা হচ্ছে শারীরিক-মানসিক সেবা-শুশ্রূষা এবং আশ্রয়-প্রশ্রয়। বস্তুত নারী, বিশেষ করে প্রবীণ নারীর কাছে পাওয়া যায় এই দুর্লভ উপাদান। সন্তানসম্ভবা মা আজও ছুটে যান তারই মায়ের কাছে, যেখানে উপস্থিত বয়স্ক মা-দাদি-নানিদের অভিজ্ঞতাপুষ্ট সাহস দান এবং সেবাযত্নে সন্তানের প্রসব কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করে। শৈশব-কৈশোর-তারুণ্যে মা-ই হচ্ছেন সন্তানের আশ্রয়-প্রশ্রয় আর দেখভালের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বিশেষ করে, কন্যাসন্তানের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনোন্নয়নে তার মা-দাদি-নানির পরামর্শ এবং তত্ত্বাবধান আমাদের সমাজের এক ধন্বন্তরি ব্যবস্থা। জাতিসংঘ প্রবীণজনদেরকে উন্নয়নের নতুন শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে বলেছে। বিশেষত বিশ্বের নানা অঞ্চলে এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে তরুণ ও মধ্যবয়সি পিতামাতার মৃত্যু ঘটলে তাদের রেখে যাওয়া অনাথ সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব পালন করেন বেঁচে থাকা শিশু-কিশোরদের দাদাদাদি/নানানানিরা। অন্যদিকে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট দুর্যোগ-দুর্দিনে গ্রামীণ এবং দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার পরিবারে প্রবীণ নারীরা তাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে এমন সব লাগসই উপদেশ দেন, যা অনুসরণ করে পরিবারের সদস্যগণ তাৎক্ষণিকভাবে খানিক পরিত্রাণ লাভ করে এবং দুর্যোগ-পরবর্তীকালে পুনর্বাসন এবং সক্ষমতা অর্জনে বলীয়ান হয়। নিয়মিতভাবে দুর্যোগে আক্রান্ত বাংলাদেশের প্রবীণ নারীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর সক্ষমতা এবং সহনশীলতা অর্জনে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। গেল কয় বছরের বৈশ্বিক অতিমারি কোভিড-১৯ বা করোনার দিশাহারাকালে প্রবীণ নারীর সহনশীলতা, সক্ষমতা এবং পারিবারিক-সামাজিক অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে বিশ্বব্যাপী উচ্চারিত হয়েছে। প্রবীণ নারীর অন্যতম সক্ষমতা এবং অবদান হচ্ছে তার বয়স্ক/অতিবয়স্ক স্বামীর দেখভাল করা। শারীরিক-মানসিক নানা রোগশোক, দুর্বলতা এবং সীমাবদ্ধতার উপদ্রবে জর্জরিত এই স্বামীর সেবাশুশ্রূষার কাজে প্রধানত তার স্ত্রী, যিনি নিজেও একজন প্রবীণা, একনিষ্ঠভাবে দরকারি সেবাযত্ন প্রদান করে যান। এমনকি, অভিভাবক পরিত্যক্ত/মৃত, প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ইত্যাদি চ্যালেঞ্জড সন্তান/নাতিনাতনির দেখভাল এবং সেবা পরিচর্যায় দুনিয়াজুড়েই প্রবীণ নারী আমৃত্যু সক্রিয় থাকেন।

জনমিতিক পরিবর্তনের কারণে বার্ধক্যে পৌঁছে নারীরা আগের তুলনায় ক্রমশ নিরাপত্তাহীন, অসহায় এবং স্বজনহীন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়েন। এক বা দুই সন্তান জন্ম দেওয়া, সন্তানদের উচ্চশিক্ষা লাভ, পুত্রবধূ এবং কন্যাগণের শিক্ষিত এবং কর্মে জড়িত হওয়া, কর্মস্থল এবং বৈবাহিক প্রয়োজনে মা-বাবাকে ছেড়ে বাইরে বা বিদেশে চলে যাওয়া এবং সর্বোপরি বিধবা হয়ে পড়ায় প্রবীণ নারী যারপরনাই দুর্দশায় পতিত হন। অথচ এই সন্তানদের জন্ম দেওয়া, নিজে খেয়ে-না খেয়ে লালনপালন করা, মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা ইত্যাদি সকল দায়িত্বই মা নিঃস্বার্থভাবে পালন করছেন। শেষ বয়েসে পৌঁছে, অপাঙ্‌ক্তেয় এক বোঝা বিবেচিত হয়ে আর্তস্বরে তিনি স্বগতোক্তি করেন– 'যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি/আর এখন তোমার সব হয়েছে পর হয়েছি আমি!'

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আলোকিত প্রবীণ নারীর সক্ষমতা, বলিষ্ঠতা, দক্ষতা, সহনশীলতা, সৃজনশীলতা এবং কীর্তি ও অবদানের এক উপযুক্ত এবং অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করতেই হবে। রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈশ্বিক এবং পারিবারিক জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সফল এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ। জীবনের নানা পর্যায়ে ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগ-দুঃসময়, প্রতিযোগিতা-প্রতিকূলতা ইত্যাদি দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবিলা করে এবং সফল হয়ে পরিবার, দেশ ও জাতি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তিনি যে নজির স্থাপন করেছেন তা অবশ্যই এবারের আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবসের স্লোগানের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছে। জ্যোতিষ্মান এই নারীর বিচক্ষণ উদ্যোগে দেশের আপামর প্রবীণের নিরাপত্তা, সেবা এবং কল্যাণে আমরা পেয়েছি বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি (১৯৯৭-১৯৯৮ সাল থেকে), জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩ এবং পেতে যাচ্ছি সর্বজনীন সামাজিক পেনশন, প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন (প্রক্রিয়াধীন) ইত্যাদিসহ প্রবীণজনের কল্যাণে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ আরও অনেক কর্মসূচি। গর্বের বিষয় হলো, এসকল উদ্যোগের সর্বক্ষেত্রে প্রবীণা এবং নারীদের সম ও ন্যায়ানুগ অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা রাজনীতির ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে একজন সার্থক, দূরদর্শী এবং মানবহিতৈষী সমাজসংস্কারক হিসেবে এই দেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বিরাজমান থাকবেন। অন্যদিকে, বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রবীণ নারী দেশের ব্যবসায়, পেশাকর্মে, রাজনীতিতে, শিক্ষকতায়, স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগে এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ভূয়সী লাগসই তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। একইসঙ্গে দেশের পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল, উপকূল, দুর্যোগপ্রবণ, বিচ্ছিন্ন আর গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের প্রবীণ নারীদের সহনশীলতা, সক্ষমতা এবং অবদান অবশ্যই তুলনাহীন এবং প্রশংসনীয়।

ধারণা করা হয় যে, মানবসভ্যতার সমাসন্ন সবচেয়ে বড়ো হুমকি বা আপদ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বার্ধক্য। বার্ধক্য মোকাবিলায় জাতি ও সংস্থাসমূহের প্রবল সীমাবদ্ধতা এবং প্রবীণজনের আশঙ্কাজনক গতিপ্রকৃতি। তারচেয়েও বিভীষিকাময় ব্যাপার হচ্ছে, ব্যক্তিমানুষ, দম্পতি, পরিবার, সংগঠন, রাষ্ট্র ও জাতিসমূহ এমনকি গোটা বিশ্ব বার্ধক্যের ভয়াবহতা, সর্বনাশা পরিণতি ও শক্তিমত্তা এবং করণীয় বিষয়ে অসচেতন, উদাসীন, অপ্রস্তুত এবং অনাগ্রহী।

কেবল তাই নয়, সমাসন্ন বার্ধক্যের তাণ্ডবলীলা এবং উপযুক্ত মোকাবিলা সম্পর্কে সকলেই যেন অপরিণামদর্শী এবং বালখিল্য প্রকৃতির! দুনিয়াজুড়ে প্রবীণজনের সংখ্যা বাড়ছে অতি দ্রুত হারে। ১৯৯৫ সালের ৫৪ কোটি বিশ্ব প্রবীণ জনসংখ্যা ২০২৫ সালে গিয়ে হবে ১২০ কোটি আর ২০৫০ সালে প্রায় ২০০ কোটি! বাংলাদেশে বর্তমানে প্রবীণজনের সংখ্যা প্রায় ১.৪০ কোটি; কিন্তু ২০২৫, ২০৫০ এবং ২০৬১ সালে এদের সংখ্যা বেড়ে হবে যথাক্রমে প্রায় ২ কোটি, ৪.৫ কোটি এবং ৫.৫ কোটি। বাংলাদেশে শিশুদের চেয়ে প্রবীণজনের সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে ২০৫০ সাল নাগাদ। তাৎপর্যপূর্ণ পরিসংখ্যান হচ্ছে, প্রবীণ পুরুষের তুলনায় প্রবীণ নারীরা সংখ্যায় সামান্য বেশি! সাধারণ বিবেচনায় এদেশের প্রবীণজনেরা তিন ধরনের; যেমন– নবপ্রবীণ (৬০-৭০ বছর), মধ্যমপ্রবীণ (৭০-৮০ বছর) এবং অতিপ্রবীণ (৮০+ বছর বয়সি)। সবচেয়ে উৎকণ্ঠার বিষয় হচ্ছে– বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী অতিপ্রবীণদের বৃদ্ধিহার দ্রুতগতির। সবক্ষেত্রেই প্রবীণজনের মুখ্য চাহিদা হচ্ছে চিকিৎসা সেবা, আর্থিক সহায়তা, সন্তান-স্বজনের সেবাপরিচর্যা, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি। নবপ্রবীণদের মুখ্য চাহিদা হচ্ছে– পুনঃকর্মসংস্থান এবং অতিপ্রবীণদের একান্ত প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি যত্ন (Long term Care) এবং যাতনা প্রশমন সেবা (Palliative Care)। দেশের সকল শ্রেণির নাগরিকের জন্যে চালু হতে যাচ্ছে সর্বজনীন সামাজিক পেনশন (Universal Social Pension) ব্যবস্থা।

জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রবীণ নারীর সাহসী কীর্তি এবং অবদানের কথা সত্যিকার অর্থে আমরা উচ্চারণ করি পরোক্ষভাবে। তবে কিঞ্চিৎ স্বস্তির কথা হচ্ছে, প্রবীণ দাদি/নানি বা স্বজনদেরকে পরিবারের শিশু-কিশোরেরা ভীষণ পছন্দ করে; তাদের কাছে থাকতে নিরাপদ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এরা তাদের প্রবীণ দাদি/নানিকে সংসারে আঁকড়ে রাখতে চায়। কিন্তু আফসোস, পরিবারের কর্মক্ষম, উপার্জনকারী এবং সমর্থ সদস্যবৃন্দ এদের বিষয়ে খুবই উন্নাসিক এবং নির্লিপ্ত। অতিপ্রবীণ পুরুষের তুলনায় অতিপ্রবীণ নারীকে তার উপযোগী এবং কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যগত এবং আনুষঙ্গিক সেবা প্রদান করা বেশি মাত্রায় চ্যালেঞ্জিং। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা চরম বৈষম্যের শিকার হন। এমনকি হাসপাতাল/ক্লিনিকে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী এবং অন্যান্যরাও এ সময়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার মতো করে সহায়তা করেন; দুনিয়াজুড়েই প্রায় একই হাল। এর অন্যতম কারণ হলো, বার্ধক্য এবং জরাস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা (Geriatric Medicine) বিষয়ে পেশাগত কোনো কোর্স মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থায় আজও এদেশে প্রচলন করা হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লাখ প্রবীণ আছেন যাদের প্রায় সকলেই শারীরিক-মানসিকভাবে অসুস্থ এবং চিকিৎসার অপেক্ষায় আছেন। আবার এদের এক-তৃতীয়াংশ বহুবিধ অসুস্থতায় কালাতিপাত করছেন। অথচ প্রচুর প্র্যাক্টিসের সুবর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এদেশে ডিগ্রিধারী জরাস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ নেই।

যুদ্ধ ও সমরাস্ত্র, বিনোদন প্রযুক্তি, মহাকাশ উদ্‌ঘাটন ইত্যাদি ক্ষেত্রের গবেষণায় বিশ্বের তথাকথিত সভ্যসমাজ যে পরিমাণ অর্থসম্পদ বিনিয়োগ করেছে এবং করে যাচ্ছে তার তুলনায় সমাজকল্যাণ, সামাজিক সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং মানবসভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষায় অত্যাবশ্যকীয় এই বার্ধক্য মোকাবিলা কাজে তার কোটি ভাগের এক ভাগও বরাদ্দ দেয়নি। গোটা মানবজাতির জন্যে তো বটেই, ব্যক্তি বিজ্ঞানীদের একান্ত স্বার্থে বার্ধক্য মোকাবিলার লাগসই প্রযুক্তি এবং কলাকৌশল উদ্ভাবন, প্রচলন এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার এখনই সময়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০২১-২০৩০ সময়কালকে স্বস্তিময় বার্ধক্যের দশক হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রবীণ ব্যক্তির স্বাস্থ্য সচল ও সক্রিয় রাখা এবং সমাজ-সংসার তার জন্যে অনুকূল রাখাই এই দশকের মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে জাতি ও রাষ্ট্রসমূহকে গঠনমূলক এবং দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে উদাত্ত

আহ্বান জানাচ্ছে জাতিসংঘ। বার্ধক্যের মূল অভিঘাত আসে এবং চলমান থাকে ব্যক্তির উপরে, একান্তে। এরপর দম্পতি, পরিবার, সংগঠন এবং রাষ্ট্র হয়ে চূড়ান্তে গোটা বিশ্বের উপর আছড়ে পড়ে এবং পড়ছে। তাই জরাবিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো, বার্ধক্য মোকাবিলায় দুনিয়ার তাবৎ মহল এবং শক্তিকে একত্রিত করে বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর করতে হবে। বিশেষ করে বার্ধক্য বিষয়ক ভিয়েনা আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা ১৯৮২, বার্ধক্য বিষয়ক মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্মপরিকল্পনা ২০০২, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আঞ্চলিক নীতি-পরিকল্পনা, বাংলাদেশের জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ ইত্যাদিকে যথাযথভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়নে জাতিরাষ্ট্রসমূহকে আন্তরিক ও সক্রিয় হতে হবে।

বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নারীদের জন্যে দ্রুততার সঙ্গে জাতীয় পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মহল সমীপে সনির্বন্ধ আরজি জানাচ্ছি। প্রথমত, সকল শ্রেণির প্রবীণ, বিশেষ করে অতিপ্রবীণ এবং প্রবীণ নারীদের জন্যে স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রের আয়োজন করতে হবে। চলমান হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে তাদের জন্যে আলাদা কর্নার, ডেস্ক, ওয়ার্ড ইত্যাদি খোলার ব্যবস্থা এখনই নেওয়া সম্ভব। নাগরিকদের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাওয়াতে, বিশেষ করে প্রবীণ নারীদের জন্যে হাসপাতাল-ক্লিনিকে দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা সেবা, যাতনা প্রশমনসেবাসহ স্বল্পমূল্যে ওষুধ-পথ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। দ্বিতীয়ত, চিকিৎসক, নার্স, থেরাপিস্ট, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, পুষ্টিবিদ, স্বাস্থ্যসেবাকর্মী, মনোচিকিৎসক, স্থপতি, প্রকৌশলী, আইনজীবীসহ সকল পেশাজীবীদেরকে বার্ধক্য ও প্রবীণকল্যাণ বিষয়ে লাগসই ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। তৃতীয়ত, পাঠ্যপুস্তকে বার্ধক্য এবং এর চ্যালেঞ্জসমূহ, করণীয়, সেবাদান কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে পরবর্তী প্রজন্মকে অবহিত, সচেতন, সক্রিয় এবং নিজের বার্ধক্য মোকাবিলায় প্রস্তুত করে তুলতে হবে। চতুর্থত, দেশের বিরাট সংখ্যক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ইমাম, পুরোহিত, পাদরি, বৌদ্ধযাজক প্রমুখদের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে প্রবীণ-প্রবীণাদের দেখভাল এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার ব্যবস্থা নিতে হবে। পঞ্চমত, রাষ্ট্রিক পর্যায়ে এমন একটি দপ্তর বা বিভাগ গঠন করা জরুরি, মুসলিম নারীরা স্বামীর কাছে তাদের প্রাপ্য দেনমোহর/খোরপোষের অর্থ; পিতামাতা এবং স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য উত্তরাধিকারের সম্পত্তি ন্যায়ানুগভাবে বুঝে পাবার ব্যবস্থা থাকবে। ষষ্ঠত, পিতামাতার ভরণপোষণ আইন ২০১৩-এর বিধিবিধান (দীর্ঘদিন যাবৎ প্রক্রিয়াধীন) প্রণয়ন করে আইনটি কার্যকর বা অনুশীলনযোগ্য করা খুবই জরুরি। সপ্তমত, সুদীর্ঘ বছর ধরে প্রক্রিয়াধীন প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইনের খসড়াটি মন্ত্রিপরিষদ হয়ে মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে আইনে পরিণত করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। অষ্টমত, প্রবীণ-প্রবীণাদের অধিকারভিত্তিক এবং মর্যাদাপূর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণ এবং কল্যাণবিধানে সমাসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনি ইশতাহারে আরও জোরালো এবং বাস্তবায়নযোগ্য প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশা করা অত্যন্ত যৌক্তিক।

সম্ভাব্য বিধবা স্ত্রীর বার্ধক্য এবং অতিবার্ধক্যকাল যাতে করে সহনীয় হয় সেলক্ষ্যে প্রতিজন স্বামীর পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে তার জীবদ্দশায় স্ত্রীর নামে পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ সুরক্ষিত করে যাওয়া। এতে করে ঐ প্রবীণ নারীর সুচিকিৎসা এবং আনুষঙ্গিক সেবা-সহযোগিতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে। পাশাপাশি, যুব বয়স থেকে প্রতিজন নারীকে তার বার্ধক্যের সার্বিক নিরাপত্তায় সঞ্চয়ী হতে হবে। একইসঙ্গে মুসলিম নারীর বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত দেনমোহরের অর্থ দীর্ঘমেয়াদে লগ্নির উদ্যোগ সমীচীন হবে। আবার সঞ্চিত অর্থ যাতে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষিত থাকে, বিনিয়োগ লাভজনক হয় এবং শেষ বয়সে তা যথাযথভাবে কাজে লাগে সেই লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক-বীমা কর্তৃপক্ষগুলোকেও বিচক্ষণতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে আন্তরিকভাবে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ৭ই মার্চ ১৯৭১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শত্রুর মোকাবিলায় যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ বার্ধক্য মোকাবিলায় সকল মন্ত্রণালয় এবং বেসরকারি উদ্যোগ সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জাতীয় সংগীতে দেশকে আমরা মায়ের মতো করে উচ্চারণ করি। সত্যিকার অর্থে মাতৃভূমি, দেশমাতা এবং নিজের গর্ভধারিণী মাসহ সকল নারীর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা, হৃদয়ের অনুভূতি, পরম দায়িত্ব এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় আসুন আমরা বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসি। যেই মা তার জীবন বিপন্ন করে আমাদের গর্ভে ধারণ করেছেন, লালনপালন করে বড়ো করেছেন, সঙ্গে থেকে আগলে রেখেছেন, তাদের বার্ধক্যে পাশে থেকে, সম্মানের সঙ্গে দেখভাল করে এবং মুখে হাসি ফোঁটাতে আসুন স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে সকলে ন্যূনতম ঋণ পরিশোধের সুযোগ নেই। আর এতে করেই মানবসভ্যতার বাতিঘর– প্রবীণ নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়ে যাবো।

প্রফেসর ড. এ এস এম আতীকুর রহমান: অধ্যাপক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সভাপতি, বাংলাদেশ জেরোন্টলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, atiqrdu@gmail.com, atiq_du2008@yahoo.com

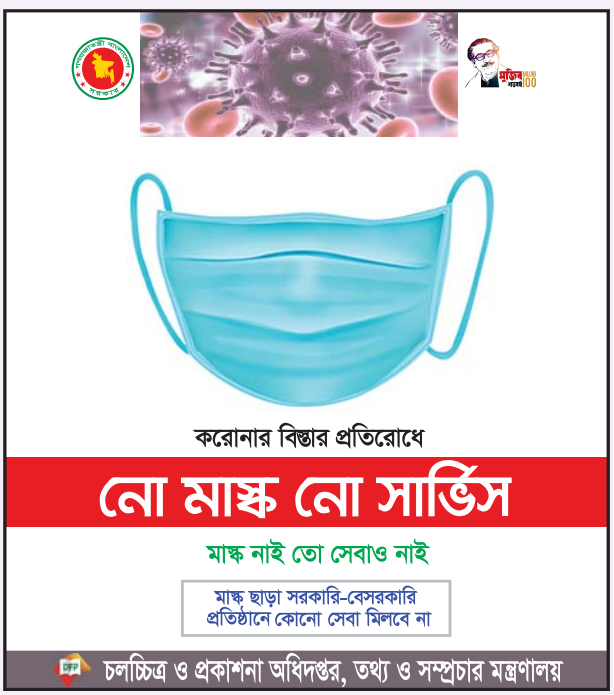

শেখ রাসেল

আলোর পথের অভিযাত্রী

প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস

শেখ রাসেল, তোমার ৫৯তম জন্মদিনে এই বাংলাদেশ তোমাকে স্মরণ করছে। মায়াবী দুঃখের মুখ নিয়ে তোমার স্মৃতিঘেরা আঙিনাগুলো জেগে উঠছে। শ্বেত কপোতের ডানা ঝাঁপটানো তোমার সকাল, পুকুরে রুপালি মাছের সঙ্গে সাঁতরানো দুপুর, বিকেলে পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গণভবনের লেক মাড়ানোর গল্প অথবা সন্ধ্যা-রাতের ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটির হইচই আর শাসন-বারণের নানা আদর তোমাকে জড়িয়ে রেখেছে যত্নে। তুমি নেই তাই ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটির অবকাঠামো তেমনি থাকলেও পালটেছে অনেক কিছুই। বঙ্গমাতা শেখ মুজিবের কোলে শুয়ে তোমার ঘুম, বড়ো বোন হাসু আপার মমতা মাখানো চেয়ে থাকা দৃষ্টি আর ভাবিদের সঙ্গে দুষ্টুমি করে তোমার দিন কখন গড়িয়ে গেল রাসেল। তোমার জন্মের পরও বঙ্গবন্ধুকে জেলে যেতে হয় বার বার। তখন তুমি ছোটো ছিলে বলে সকলের চোখের মণি হয়ে ওঠো। তুমি একটু ব্যথা পেলে সকলের মন কেঁদে উঠত। সুন্দর তুলতুলে একটা শিশু কার না প্রিয় হয়। তুমি ছিলে এদেশের সকলের আপনজন।

২

ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের যে বাড়িটিতে ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর তোমার জন্ম সেখানে এখন সুনসান নীরবতা। শেখ হাসিনা লিখেছেন, 'আমাদের পাঁচ ভাইবোনের সবার ছোট রাসেল। অনেক বছর পর একটা ছোট্ট বাচ্চা আমাদের বাসায় ঘর আলো করে এসেছে, আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। আব্বা বার্ট্রান্ড রাসেলের খুব ভক্ত ছিলেন, রাসেলের বই পড়ে মাকে বাংলায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। মা রাসেলের ফিলোসফি শুনে শুনে এত ভক্ত হয়ে যান যে নিজের ছোট সন্তানের নাম রাসেল রাখেন।' বাসার সামনের ছোট্ট সবুজ লনে ভাইবোনরা তোমার সাথে খেলায় মেতে উঠত। তোমার হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটার চেষ্টা সবই স্পষ্ট ছবি হয়ে আছে এখন। শেখ হাসিনাকে 'হাসুপা' বলে ডাকতে তুমি। কামাল ও জামালকে ভাই, আর রেহানাকে আপু। কামাল ও জামালের নাম কখনও বলতে না। অনেক চেষ্টা করার পর ডেকেছিলে– 'কামমাল', 'জামমাল'। তবে সবসময় 'ভাই' বলেই ডাকতে তাদের। শিশুকাল থেকে চলাফেরায় তোমার ছিল সাহসী আর সাবধানি আচরণ। তোমার অতি প্রিয় দুটি সাইকেল এখনও রয়েছে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটিতে। যে সাইকেল নিয়ে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটত তোমার।

৩

রাসেল ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা হাসুপার অতি কাছের। অবসর সময় কাটত তাকে নিয়ে। ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হলে রাসেলের মুখের হাসি মুছে যায়। সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে রাসেল তার আব্বাকে খুঁজত। আর তখন তার মা বেগম মুজিবও ব্যস্ত স্বামীর মামলা-মোকদ্দমা সামলাতে, পাশাপাশি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে যোগাযোগ রাখতে। ফলে রাসেলের যত্ন না পাওয়ারই কথা। কিন্তু শেখ হাসিনা তার কাছে থেকেছেন। ৩২ নম্বর সড়কের বাড়ির আঙিনাজুড়ে কবুতর ঘুরে বেড়াত। আর রোজ সকালে রাসেলকে কোলে নিয়ে বেগম মুজিব তাদের খাবার দিতেন। রাসেল বড়ো হতে থাকলে খেলার সাথি হিসেবে কবুতরের পেছনে ছোটা আর নিজে হাতে করে খাবার দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। কিন্তু ওকে কখনও কবুতরের মাংস খাওয়াতে পারেনি কেউ। যেন পোষা পাখির প্রতি বাল্যকাল থেকে তার অন্তরে মমতা জেগে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু জেলে থাকার সময়গুলো পিতার অভাব ভুলিয়ে রাখার জন্য পরিবারের সকলের চেষ্টা থাকত নিরন্তর। বাসায় পিতার জন্য কান্নাকাটি করলে বেগম মুজিব তাকে বোঝাতেন এবং তাকে আব্বা বলে ডাকতে শেখাতেন। শেখ হাসিনা লিখেছেন, মাকেই আব্বা বলে ডাকতে শুরু করে। ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা মামলায় আসামি করে অজ্ঞাত স্থানে আটক রাখা হলে পরিবারে নেমে আসে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া। সেসময় রাসেলের শরীর খারাপ হয়ে যায়। যেন শিশু মন টের পায় পিতার সংকট কতটা গভীর। ১৯৬৮-১৯৬৯ সালের দিকে সবাই যখন আন্দোলনে ব্যস্ত তখন সে বাড়ির কাজের লোকদের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে। এমনিভাবে সে কাজের লোকদের সাথে ভাত খেতে পছন্দ করতে শিখেছিল। চার বছর বয়সেই সে বাড়ির পোষা কুকুর টমির সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে নিয়েছিল। টমিকে সে খুবই ভালোবাসত। হাতে করে খাবার দিত। নিজের পছন্দমতো খাবারগুলো টমিকে ভাগ দেওয়া

ছিল একটি কাজ। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারিতে প্রায় তিন বছর পর বঙ্গবন্ধু মুক্ত হলে রাসেল খেলার ফাঁকে ফাঁকে কিছুক্ষণ পরপরই পিতাকে দেখে আসত। পিতা বাড়ির নীচে অফিস করতেন। সারাদিন নীচে খেলা করত সে আর কিছুক্ষণ পরপর বঙ্গবন্ধুকে দেখতে যেত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ ভয়াল রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হলে পরদিন হামলার মুখে পড়ে মা'র সঙ্গে রাসেলকেও দেওয়াল টপকে পালাতে হয়। তারপর দীর্ঘ নয় মাস ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের বাড়িতে বন্দি থাকতে হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর পাহাড়ায়। তখন রাসেলের দিনগুলো কেটেছে নিরানন্দে। প্রথমদিকে রাসেল বঙ্গবন্ধুর জন্য খুব কান্নাকাটি করত। তার ওপর ভাই কামাল মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ায় তাকে পায়নি, সেটাও তার জন্য কষ্টকর ছিল। মনের কষ্টে চোখের কোণে সবসময় পানি থাকত তার। তবে ছোটোবেলা থেকে মনের কষ্ট নিজেই বহন করতে শিখেছিল রাসেল। ১৯৭১ সালে সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম হলে বন্দিখানায় তোমার আনন্দ সঙ্গী জুটেছিল। সারাক্ষণ তার পাশেই থাকত সে। একাত্তরে ঢাকায় বিমান হামলার সময় রাসেল তুলা নিয়ে এসে জয়ের কানে গুঁজে দিত। স্নেহ-মমতায় অন্তরপূর্ণ সার্থক মানুষ হয়ে উঠেছিল সে।

৪

শেখ রাসেল, একাত্তরে তুমি ছিলে তোমার প্রিয় সব খাবার থেকে বঞ্চিত, খেলার সাথি ছাড়াই তোমাকে বন্দিশালার জানালা দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করা দেখতে দেখতে নয় মাস কাটাতে হয়েছে। যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা দেখার সুযোগ না হলেও রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হওয়ায় তোমার ভেতর মানুষের জন্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল গভীর মমত্ববোধ। ১৯৭১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তুমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলে মুক্তির আনন্দ। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে শত্রু তাড়ানোর সেই উল্লাস পরিবারের সদস্যদের চোখের পানিতে ধুয়ে গেছে। তাঁদের দুঃখ দেখলে তোমার মন খারাপ হয়ে যেত। অবশ্য যুদ্ধ শেষে কামাল ও জামালকে পুনরায় কাছে পেয়ে পৃথিবী ঝলমল করে উঠলেও তখনও পিতাকে তুমি খুঁজে ফিরছিলে।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন। এয়ারপোর্টে গিয়েছিলে পিতাকে আনতে। সেদিন লাখো মানুষের ঢলে পিতাকে নিয়ে তোমার খুব গর্ব হয়েছিল রাসেল? সবচেয়ে আনন্দের সেই দিনটি কেবল তোমার নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির ছিল। এজন্য তুমি যেমন পিতাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে চাইতে না তেমনি আমাদের জনগণও। তুমি যেন হয়ে উঠলে জনগণের প্রতীক। বঙ্গবন্ধুকে এদেশের মানুষ ভালোবেসেছিল নিঃস্বার্থভাবে; যেমন তুমি পিতাকে। তোমার ভালোবাসার সারণিতে এখনও আমরা দাঁড়িয়ে আছি রাসেল। স্বাধীনতার পর ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে পুনরায় তোমার হাসিমুখে ঘুরে বেড়ানো শুরু হয়। সাইকেলে চড়ে তুমি ব্যস্ত হয়ে ওঠো সারাদিন। তারপর পুরনো গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর ছোটো ছেলের সার্বক্ষণিক আনাগোনা। বিকেলে সাইকেলটাও সাথে থাকত। তোমার খুব শখ ছিল মাছ ধরার। তা ছিল খেলা। কারণ মাছ ধরে আবার ছেড়ে দিতে তুমি। নাটোরের উত্তরা গণভবনেও তোমাকে সেরকমই দেখা গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্র ছিলে। কিন্তু বাসায় তোমাকে পড়াতে গিয়ে শিক্ষককে তোমার কথাই শুনতে হতো বেশি। তোমার কথায় পড়াতে আসা শিক্ষয়িত্রীকে প্রতিদিন দুটো করে মিষ্টি খেতে হতো। মানুষকে আপ্যায়ন করতে খুবই পছন্দ করতে তুমি। টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে গেলে তোমার খেলাধুলার অনেক সাথি জুটে যেত। প্রত্যেকের জন্য খাবার কিনে দিতে। বেগম মুজিব তাদের জন্য জামাকাপড় নিয়ে যেতেন। গ্রামের শিশুদের সঙ্গে তোমার সেই মৈত্রীর বন্ধন অনেকেই এখনও স্মরণ করেন। তুমি হতে চেয়েছিলে আর্মি অফিসার। কামাল-জামালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে তার অনুপ্রেরণা জন্মেছিল।

৫

পিতার সঙ্গে রাসেলের সম্পর্ক ছিল চিরন্তন পিতৃ হৃদয়ের মমতা মাখানো। পিতাকে মোটেই ছাড়তে চাইত না সে। যেখানে যেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব প্রধানমন্ত্রী তাকে নিয়ে যেতেন। বেগম মুজিব তার জন্য প্রিন্স স্যুট বানিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ পিতা প্রিন্স স্যুট যেদিন পরতেন রাসেলও পরত। পোশাকের ব্যাপারে ছোটোবেলা থেকেই তার নিজের পছন্দ ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তার চরিত্রে দৃঢ়তা গড়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুর জাপান সফরের সময় রাসেলও সেখানে যেতে পেরে আনন্দে মেতে উঠেছিল। তবে মাকে ছেড়ে কোথাও তার থাকতে খুব কষ্ট হতো। বাইরে পিতা সান্নিধ্যে থেকেও মার কথা মনে পড়লেই মন খারাপ করত সে। কারণ বঙ্গবন্ধুর অধিকাংশ সময় জেলে কেটেছে। এজন্য মাকে কেন্দ্র করে তার প্রাত্যহিক জীবন গড়ে উঠেছিল। ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কামাল ও জামালের বিয়ের অনুষ্ঠানে রাসেল ওর সমবয়সিদের সাথে মিলে রং খেলেছিল। বিয়ের পর সবসময় ভাবিদের পাশে ঘুর ঘুর করত সে; কার কী লাগবে খুব খেয়াল রাখত। ১৯৭৫-এর ৩০শে জুলাই শেখ হাসিনা জার্মানিতে স্বামীর কর্মস্থলে যাওয়ার পর রাসেলের খুব মন খারাপ হয়ে যায়।

৬

শেখ হাসিনা জার্মানি যাওয়ার সময় রাসেলকে সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার হঠাৎ জন্ডিস হওয়ায় শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। সে কারণে বেগম মুজিব তাকে আর শেখ হাসিনার সাথে যেতে দেননি। রাসেলকে যদি সেদিন তিনি সাথে নিয়ে যেতে পারতেন তাহলে তাকে আর হারাতে হতো না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে ক্ষতবিক্ষত করা হয় ছোট্ট রাসেলকে। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে সবার শেষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় শেখ রাসেলকে। তার আগে সে বার বার বলেছিল, 'মায়ের কাছে যাবো'। তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি খেতেও চেয়েছিল। মায়ের কাছে নেওয়ার নাম করেই হত্যা করা হয় শিশু রাসেলকে। মাত্র ১০ বছর ৯ মাস ২৭ দিনের স্বল্পায়ু জীবন ছিল তার। আজ জন্মদিনে তাকে আমরা স্মরণ করছি– একটি রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুর অন্তরবেদনা, তার মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতার সম্পর্ক বোঝার জন্য। প্রাণোচ্ছল শিশু শেখ রাসেল মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছিল, বঙ্গবন্ধুর আনন্দের সঙ্গী ছিল আর বাঙালির চিরন্তন পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনে তার অনাবিল উচ্ছ্বাস ছিল অফুরন্ত। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ রাসেল পিতামাতা ও অন্যদের সঙ্গে যে নিষ্ঠুরতার নির্মম শিকার হয়েছিল তা এখনও বিশ্ব মানবতাকে বিচলিত করে। আমরা সেই পৈশাচিকতা থেকে আলোর পথে বের হয়ে আসতে চাই। তাই স্মরণ করি শেখ রাসেলকে।

প্রফেসর ড. মিল্টন বিশ্বাস: বঙ্গবন্ধু গবেষক, বিশিষ্ট লেখক, কবি, কলামিস্ট, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রগতিশীল কলামিস্ট ফোরাম, নির্বাহী কমিটির সদস্য, সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, drmiltonbiswas1971@gmail.com

মিতব্যয়িতার মূল্যবোধ

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

'আয় বুঝে ব্যয় এবং পুঁজি বা সক্ষমতার ভবিষ্যৎ সুরক্ষার স্বার্থে সঞ্চয়', কিংবা 'কাট ইওর কোট একোরডিং টু ইওর ক্লথ', কিংবা 'কলা রুয়ে না কেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত', কিংবা 'অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই'– এসব মহাজন বাক্য অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে স্থান কাল পাত্র ভেদে প্রযোজ্য এবং এসবের ভিত্তিতে মিতব্যয়িতা একটি অয়োময় প্রত্যয়ের, বোধ-বিশ্বাসের, অনুভব-অনুভূতি আর স্বভাব-অভ্যাসের নাম বা মূল্যবোধের উদ্‌গাতা। উনিশ শতকের বাঙালি স্বভাবকবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৪-১৯০৭) সেই চিরস্মরণীয় পয়ার ছন্দবদ্ধ দুটি লাইন 'যে জন দিবসে মনের হরষে, জ্বালায় মোমের বাতি, আশুগৃহে তার দেখিবে না আর, নিশীথে প্রদীপ ভাতি'। মানবজীবনের অতি অপরিহার্য বিষয় 'মিতব্যয়িতা' নিয়ে চরণ দুটিতেই যথার্থভাব ফুটে উঠেছে। অর্থব্যয়ের তিন ধারা কার্পণ্য, মিতব্যয় আর অপব্যয়-এর মধ্য থেকে মধ্যপন্থা মিতব্যয়িতা উৎসাহিত করতেই খনার বচন, গীতি-কবিতা, ছন্দ, গালমন্দ, আদেশ, উপদেশ, ধর্মীয় আদর্শ, মনুষত্ব, সামাজিক রীতি হিসেবে কার্পণ্য পরিহার ও অপচয়ের ভীতিকে সামনের সারিতে আনা হয়েছে। সব ধর্মে মিতব্যয়কে উৎসাহিত করে কার্পণ্য ও অপব্যয়কে নিন্দা জানিয়েছে। আর এ কারণে মিতব্যয় একটি উত্তম কাজ আর কার্পণ্য ও অপব্যয় নিন্দিত কাজ। মিতব্যয় মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে এবং অন্যকে সাহায্য করার পথ উন্মুক্ত করে। মিতব্যয়ীরা কখনোই নিঃস্ব হয় না। সে কারণে কার্পণ্য নয়, ব্যয়ের ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বনের স্বীকৃত ধারায় চলাচলের জোরালো পরামর্শ পরিব্যাপ্ত হয়েছে যুগে যুগে, প্রয়োজনীয়তার তাগিদে।

বৈশ্বিক পর্যায়ে কেবল প্রস্তুতকৃত খাদ্য অপচয় নষ্টের পরিমাণ প্রতিবছর ১৩০ কোটি টন, যা ব্যবহারের অতিরিক্ত রান্না করা হয়, যা উচ্ছিষ্ট থাকে, খাবারের বাড়তি হিসেবে ময়লা আবর্জনার স্তূপে যা নিক্ষিপ্ত হয়। পরিবেশ ক্ষতি ছাড়া টাকার অংকে তা ৬০ লাখ কোটি টাকা। সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ অপচয় করে কোটি কোটি টাকার খাবার, আর এর মাশুল দিতে হয় পথের পাশের মানুষগুলোকে। মানব সম্পদ এবং খাদ্য সংরক্ষণ সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতিদিন ২০ কোটি মানুষ ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাতে ঘুমাতে যায়। পরিসংখ্যান বলছে, ধনী দেশসমূহে অর্থাৎ উন্নত বিশ্বের রাষ্ট্রের অল্প কয়জন লোকের পরিমিত, সীমিত চালচলনের ফলে যে পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে তাতেই পুরো পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের বসিয়ে বসিয়ে বরাবর তিন বছর খাওয়ানো যাবে। এর সূত্র ধরে বলা যায়, যে জাতি যত মিতব্যয়ী, সে জাতি তত উন্নত, আর্থসামাজিক দিক থেকে তত বেশি সুসংহত। এ কথা ব্যক্তির বেলায় আরও বেশি প্রাসঙ্গিক, প্রয়োজনীয়, যথার্থ ও কল্যাণকর।

এটা অনস্বীকার্য যে অপব্যয়ই দরিদ্রতা ডেকে আনে। নিজেকে অসহায়ত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ করা হয়। মানুষ অমিতব্যয়ী জীবনে কখনও কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। জীবনের চাহিদা ও সঞ্চয়ের পরিমাণের মধ্যে সংগতি না থাকলে, সমন্বয় না হলে পরিণাম অবধারিত অর্থসংকট।

সংসারের দাবি তো থাকবেই, চাহিদার শেষ বলে কোনো কিছু নেই। তথাপি অতিরিক্ত বিলাসিতা পরিহার করে প্রয়োজনীয় ব্যয়নীতি অবলম্বন করাই মিতব্যয়িতা। সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মসৃণ পথচলা, পরিকল্পিত বাজেট নির্ধারণ করে চাহিদা ও সামর্থ্যকে সমন্বয় করা, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান দ্রব্যাদির অন্যতম 'অর্থ'কে ভোগান্তিহীন, নিরাপত্তাপূর্ণ করার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত নগদ অর্থ বিলিবণ্টন ব্যবস্থার মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা, তৈরি করে রাখা, মানবিক কল্যাণে ব্যয়ের মানসিক শক্তি অর্জন করা, নিজের ও পারিবারিক সুস্থতা নিশ্চিতকরণে প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাতে কোনোরকম অবহেলা-কৃপণতা না করাও প্রকৃতপক্ষে পরোক্ষভাবে ব্যয়সংকোচনের বুদ্ধিমান পন্থা। সর্বোপরি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবেশের ওপর ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় এমন কাজ থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকা, অকারণে অবহেলায় সময় নষ্ট না করে নিরলসভাবে অবসর সময় কাটানোও মিতব্যয়িতা। নিজের ওপর ভাবনার ডালপালা মেললেই মিতব্যয়িতার সহজে প্রমাণ হয়ে যায়। এক টাকা কম খরচ করার অর্থই টাকার অধিক আয় আর ব্যয়ের সমন্বয়। এটাই মিতব্যয়িতা। সে বিবেচনায় মিতব্যয় একটি বড়ো ধরনের আয়। প্রয়োজনীয়তা আর যৌক্তিকতা বিবেচনায় আনার কৌশলই হলো মিতব্যয়। কঠোর শ্রমের মাধ্যমে, বিনিময়ে অর্জিত সম্পদ হেলাফেলায় ব্যয় করাই অমিতব্যয়। পবিত্র কোরানে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাইয়ের সাথে তুলনা করে বাকিদের সম্পদ ব্যয়ে সুষম হতে, পরিমিত, প্রয়োজনভিত্তিক হতে সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অর্থ। সেই অর্থ যদি অপব্যবহার হয়, অপরিমিত হয়, অতিরিক্ত হয় তা বিপজ্জনক হয়, ব্যয়কারী মানুষ অমানুষের কাতারে শামিল হয়।

পৃথিবীতে সম্পদহীন, বিত্তহীন লোকের সংখ্যা বেশি। বিত্তহীনদের চিত্তকে প্রফুল্ল করতে, বিকাশ ঘটাতে সম্পদশালীদের প্রতি সহানুভূতি জাগাতে মিতব্যয়িতার মূল্যবোধকে সদা সক্রিয় সচল ও বেগবান রাখার বিকল্প নেই। কেবল দুর্যোগ দৈব দুর্বিপাক আর প্রচারধর্মী অনুশাসনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে সীমিত না হয়ে স্থায়ীভাবে মিতব্যয়ী জাতি হওয়ার সাধনাই কর্তব্য। অর্থনৈতিক বৈষম্যপূর্ণ পরিবেশে অর্থের প্রাচুর্য আর সম্পদের বাহাদুরি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুজতে হবে। অন্যায়, অবৈধ পথে প্রাণপণে সম্পদ সংগ্রহের অপতৎপরতা রোধ করতে হবে। সম্পদ আর প্রাচুর্য জীবনের সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য নয়, তা উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট দৃষ্টান্ত তৈরি করতে হবে। যদিও অর্থ উপার্জনের প্রবণতা ধনী, গরিব, কাঙাল, ভিখারি সকলের মাঝেই বিদ্যমান। এখানে তৃপ্তির

বিষয়টি মুখ্য। দীন-দরিদ্র, ভুখা-নাঙ্গারাও অর্থ উপার্জন করে। উপার্জনই যে যথার্থ পরিচয় নয়, মূল পরিচয় ব্যয়ের ধারার মধ্যে, ধারাবাহিকতার ভিতরে প্রবাহমান, ব্যয়ের ক্ষেত্রসমূহকে নানাভাবে বিবিধ কারণে, বিবেচনায় আনা দরকার। বাড়াবাড়ি কিংবা সীমালঙ্ঘন কোনোটাই অনুমোদিত হিসাবের মধ্যে আমলে আনা যাবে না। ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থার জীবন দর্শন সর্বজন গ্রাহ্য ও গ্রহণীয় হওয়া উচিত।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বনই মিতব্যয়িতা। অন্যভাবে বলা যায়, কৃপণতা না করে প্রয়োজন মতো অথবা হিসাব করে ব্যয় করার নাম মিতব্যয়িতা। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের নাগরিকদের জন্য মিতব্যয়িতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ এ দেশের মানুষের মধ্যে অপচয়ের প্রবণতা প্রকট।

মিতব্যয়িতার সঙ্গে সঞ্চয়ের একটি বড়ো সম্পর্ক রয়েছে। কারণ কোনো মানুষ মিতব্যয়ী হলেই সেখান থেকে অর্থ বাঁচিয়ে সেটা সঞ্চয় করতে পারে। কবির কবিতায় আছে, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা, বিন্দু বিন্দু জল, গড়ে তোলে মহাদেশ, সাগর অতল'– যা সঞ্চয়ের চেতনার সঙ্গে মিলে যায়।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইতালির মিলানে সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের কংগ্রেসে অর্থনীতি, দর্শন, বিলাসী মানসিকতায় আচ্ছন্ন না হওয়া, মানসম্পন্ন টেকসই অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ী জিনিসের সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ ব্যবহারে নিশ্চিত ইত্যাদি বিষয় আলোচিত পর্যালোচিত হয়ে সেখানেই সিদ্ধান্ত হয় বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস পালনের। প্রথম আন্তর্জাতিক সঞ্চয়ী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। সমৃদ্ধি ও সম্পদের জন্য সঞ্চয় অপরিহার্য ভাবনা মাথায় রেখে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩১শে অক্টোবর প্রতিবছর সৃজনশীলতার সাথে 'বিশ্ব সঞ্চয় দিবস' বা 'বিশ্ব মিতব্যয়িতা দিবস' বা 'ওয়ার্লড সেভিংস ডে' পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারিভাবে প্রতিবছর দিবসটি পালিত হয় এবং জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর এ উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসটি উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে।

এই দিনটিতে প্রচারের মাধ্যমে প্রতিটি দেশের তথা বিশ্বের অর্থনীতির জন্য এবং ব্যক্তিগণের জন্য সঞ্চয়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বর্তমানে এই দিবসটি বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে পালন করা হয়। এদিন সেভিংস ব্যাংকগুলো স্কুল-কলেজ, অফিস, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও মহিলা সমিতির সহায়তার কর্মসূচি পালন করে।

সঞ্চয়ের প্রবণতা কিছু কিছু প্রাণীর সহজাত ধর্ম। অন্যদিকে দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের সঞ্চয়ের শিক্ষা। অর্থ সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতা সুরক্ষিত এবং চিন্তামুক্ত জীবনযাপনের জন্য খুবই প্রয়োজন। এই সঞ্চয় যে কেবল ব্যক্তিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করে তাই নয়, দেশের আর্থিক সুরক্ষা ও উন্নয়নে সহায়ক হয়। বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশে ব্যাংকগুলো 'বিশ্ব সঞ্চয় দিবস' পালনে জোর দেয় এবং ব্যবস্থা করে যে সমস্ত অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা নেই, সেই অঞ্চলে শাখা তৈরির। মোট কথা বিশ্বজুড়ে মানুষকে সঞ্চয়ী করে তোলার মহতী প্রচেষ্টার পেছনে রয়েছে, যেমন প্রত্যেক মানুষের সুরক্ষিত জীবনের চিন্তা, তেমনি রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস।

মানবজীবনে মিতব্যয়িতা একটি অতি অপরিহার্য বিষয়। মিতব্যয় প্রতিটি মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি ডেকে আনে। ব্যক্তি জীবনে যত বেশি সঞ্চয় হবে, ততই বাড়বে ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা। মিতব্যয় মানুষের সম্পদকে বৃদ্ধি করে এবং অন্যকে সাহায্য করার পথ উন্মুক্ত করে।

আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সম্পদ সংগ্রহের পন্থা হচ্ছে স্বেচ্ছায় সঞ্চয় এবং কর সংগ্রহের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়। স্বেচ্ছায় সঞ্চয় যত বৃদ্ধি পাবে কর বা রাজস্ব আহরণের উপায় বা সুযোগ তত ব্যাপক হবে। দেশি-বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা তত কমে আসবে। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই উন্নত দেশগুলো এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

আয় করা যত কঠিন, ব্যয় করা ততই সহজ। মানুষ আয়েশি জীবনযাপনের জন্য কিছু অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করে, যা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলকর নয়। বাংলাদেশের মতো একটি দেশের নাগরিকদের জন্য মিতব্যয়িতা অত্যাবশ্যক। অপচয়কারীরা নিজের জন্যতো নয়ই বরং সমাজ, পরিবার ও জাতির জন্যও কিছু করতে পারে না। বিজ্ঞানী ফ্রাকলিন বলেছেন, 'ছোটো ছোটো ব্যয় সম্পর্কে সচেতন হও। একটি ছোটো ছিদ্র মস্ত বড়ো জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে।'

উল্লেখ্য, সঞ্চয়ের জন্য ধনী হওয়ার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক মানুষের একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন থাকে। এই স্বপ্ন থেকেই জন্ম নেয় প্রত্যয়। দৃঢ় প্রত্যয় থেকেই গড়ে ওঠে সঞ্চয়ের প্রবণতা।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সরকারের সাবেক সচিব, এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান, mazid.muhammad@gmail.com

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা হোক

যদি থাকে নৈতিকতা
আসবে সবার সফলতা

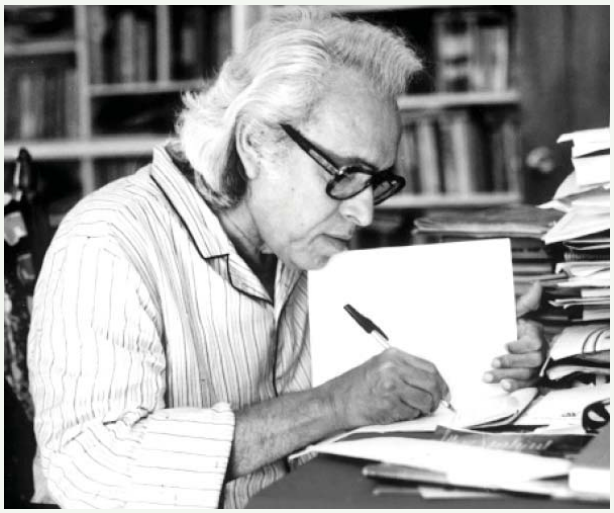

শামসুর রাহমান: বাংলা কবিতার সার্বভৌম কবি

ড. শিহাব শাহরিয়ার

প্রতিবছরই শামসুর রাহমানের জন্মদিন আসে, আসে মৃত্যুদিনও। তাঁকে হয়ত স্মরণ করি, হয়ত করি না। তিনি তো আর এখন চোখের সামনে নেই। যে নান্দনিক চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে সরব ছিলেন, যে কবিতার মর্মবাণী নিয়ে আমাদের ভেতরের আত্মাকে নাড়াতেন, বাংলা কবিতার সেই সার্বভৌম কবিকে বড়ো বেশি মনে পড়ে আজ। শরতের সাদা মেঘের মতো, সাদা কাশফুলের মতো তাঁর কেশ, তিনি সুন্দর, লাবণ্যময়, মনোহর, উত্তম, সুষ্ঠু, কলামণ্ডিত, গৌরবর্ণ, রূপবান, তিনি বুদ্ধিমান, অমায়িক, অসাধারণ, সৌম্য-পুরুষ, তিনি রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতার সার্বভৌম কবি। তিনি গত পঞ্চাশ বছর ধরে কবিতার মাধ্যমে জয় করেছেন বাংলা কবিতার পাঠকদের হৃদয়। তিনি সমকালের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি প্রবাদ প্রতীম কবি শামসুর রাহমান (জন্ম: ২৩শে অক্টোবর ১৯২৯, মৃত্যু: ১৭ই আগস্ট ২০০৬)।

আর চেয়ে দেখি মৃত্তিকায় করোটিতে জ্যোৎস্না জ্বলে
বিষণ্ন স্মৃতির মতো, দ্বিতীয় মৃত্যুর ধ্বনি ভাসে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার শেষ দুচরণ, যেখানে মাটি, জ্যোৎস্না, বিষণ্ন স্মৃতি আর মৃত্যুর কথা উচ্চারণ করে কবি আগাম জানান দিয়েছেন, মৃত্যুই চিরসত্য, চিরনিদ্রায় এক এক করে সকলেই শায়িত– কবিও। ২০০৬ সাল। ভাদ্রের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দুপুর– মৃত্যুকে বরণ করে প্রিয় কবি চিরতরে চলে গেছেন, খাঁ খাঁ শূন্যতায় হাহাকার করছে এখন বাংলাদেশের বুক। আমরা তাঁর অন্তিম যাত্রা অবলোকন করেছি। কবি শেষবারের মতো মাটি ও মায়ের বুকে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাংলা কবিতার প্রাণপুরুষ কবি শামসুর রাহমান পরলোকগমন করেছেন। তাঁকে আর দেখা যায় না শ্যামলীর নির্জন বাড়িটির নিবিড় কক্ষে, রৌদ্র-ছায়াময় ছোট্ট বারান্দায় নান্দনিক চেয়ারে বসে সুন্দর হস্তাক্ষরে কবিতা লিখতে দেখা যায় না কাগজের পাতায়, ছোটো পর্দায় কিংবা আর আসেন না কোনো অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে– আমরাও আর গাড়ি নিয়ে যাই না কবিকে আনতে, কিংবা ৯১১৬৩৫০-তে ফোন করে বলি না, রাহমান ভাই একটা কবিতা দিবেন...?

রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দকে জীবন্ত দেখিনি কিন্তু শামসুর রাহমানকে দেখেছি কাছে থেকে, খুব কাছে থেকে। পেয়েছি তাঁর একান্ত সান্নিধ্য, স্নেহ, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সাহায্য, সহযোগিতা। আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয় পাস করা অসংখ্য শিক্ষিত কর্মহীন তরুণকে, বিশেষ করে তরুণ লিখিয়েদেরকে চাকরির জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারকে সুপারিশ করেছেন। ১৯৯৫ সালে গণসাহায্য সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠানে আমার চাকরির জন্য সুপারিশ করেছেন কবি শামসুর রাহমান, বাংলা ভাষার সকল কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের প্রিয় রাহমান ভাই।

রাহমান ভাইয়ের তল্লাবাগ ও শ্যামলীর বাসার পরিপাটি কক্ষে কতবার, কতদিন গিয়েছি, কথা বলেছি, আড্ডা দিয়েছি, লেখা আনতে গিয়েছি, তাঁর স্ব-কণ্ঠে কবিতা শুনেছি, তাঁর শরীরের খোঁজখবর নিয়েছি তার হিসাব নেই। হিসাব রাখা হয়নি। এত নম্র, শান্তভাষী জাতকবি, বন্ধুবৎসল, রোমান্টিক, প্রেমিক, সামাজিক, গণতান্ত্রিক, মানবতাবাদী, উদার, নৈতিক মানুষের দেখা আর কোনোদিন পাবো না– তাতে মন ভীষণ খারাপ, কষ্ট আর দুঃখে হৃদয় ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশ।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে রাহমান ভাই একজন অভিভাবক ছিলেন। আমার পরিবারের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। আমার সহোদর অগ্রজ কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল এবং আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে বর পক্ষের একজন হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। আমার মিরপুরের বাসায় স্ব-স্ত্রীক তিনি এসেছেন কয়েকবার।

আমি রাহমান ভাইকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছি। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনেক অনুষ্ঠানে তিনি গিয়েছেন। তখন গাড়িতে, বাসায়, স্টুডিও-তে অনেক সময় পেয়েছি তাঁর সঙ্গে কথা বলার। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা-সন্ত্রাস, দুর্নীতি, গণতন্ত্রহীনতা, মৌলবাদী শক্তির উত্থান, নানা বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কবিতা ও সাহিত্য তো আছেই কিন্তু একজন কবির ভেতর যে সংবেদনশীল, মানবিক এবং গণতান্ত্রিক অনুভূতি-চেতনা থাকা দরকার, তার পুরোটাই ছিল শামসুর রাহমানের ভেতর। দেশাত্মবোধ রাহমানের চেতনার প্রধান বেগ। কবিতায় তো বটেই, স্বশরীরেও প্রতিবাদ করেছেন স্বৈরাচার, মৌলবাদ, অপশাসন, অপসংস্কৃতি আর সামাজিক অন্ধকারের বিরুদ্ধে। এসব বিষয় নিয়ে পত্রিকায় তিনি দীর্ঘদিন কলামও লিখেছেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। এজন্য উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা নিজ বাসায় আক্রান্তও হয়েছেন। তাঁর সাহস ছিল তাঁরই সহযাত্রী কবি-শিল্পী-শুভানুধ্যায়ীরা।

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ দশক কবিতা লিখে অসংখ্য ভক্ত ও কবিতাপ্রেমী তিনি তৈরি করেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবন আমি দেখনি, কিন্তু গত পঁচিশ বছর তাঁকে দেখেছি– ব্যক্তিগত জীবনে যিনি সৎ, নির্লোভ, পরোপকারী এবং মানবদরদি ছিলেন। কবিতাই ছিল তাঁর অস্থিমজ্জা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ধ্যানজ্ঞান। একজন কবির যে গুণাবলি থাকা দরকার তার সবই ছিল। তাঁর কবিতা পড়ে পড়ে নিজেকে তৈরি করেছি কবিতা লেখায়। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, তাঁকে আধুনিক কবিতার আদর্শিক পুরুষ মনে করে কবিতার পথে এগিয়ে গেছি। আশির দশকের গোড়াতে যখন কবিতা লিখতে শুরু করি, তখন কবি শামসুর রাহমানের কবিতা ছিল পথের আলো। যাকে বলা যেতে পারে, গাড়ির হেডলাইট। বড়ো কাগজ, ছোটো কাগজ যেখানেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতো, হট কেকের মতো পড়ে নিতাম। নতুন শব্দ, উপমা, চিত্রকল্প বিশেষ করে তাঁর আধুনিক কাব্যভাষা আমাকে প্রাণিত করেছে। এরপর যখন তাঁর কাছাকাছি গিয়েছি, যখন দূরত্ব ঘুচে গেছে, তখন কাছের আপনজনের মতো তাঁকে পেয়েছি, এই পাওয়া ষাট-সত্তর-আশি-নব্বই প্রত্যেক দশকের কবিরাই পেয়েছেন।

১৯৮৭ সালে জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি হিসেবে শামসুর রাহমান বাংলাদেশের কবিদের সামনে আবির্ভূত হলেন একজন

কাণ্ডারি ও অগ্রনায়ক হয়ে। সাদা ধবধবে চুলের, ফরসা-সুশ্রী নন্দিত গড়নের শামসুর রাহমান কবিকুল ও আন্দোলনরত বাংলার গণতান্ত্রিক মানুষদের প্রিয় মানুষ হয়ে উঠলেন। ছেড়ে দিলেন *দৈনিক বাংলা* পত্রিকার প্রধান সম্পাদকের পদ। একাত্তরের ভয়াবহ সময়ে যে চাকরি ছাড়েননি, তা ছেড়ে দিলেন স্বৈরচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে। সে সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রায় প্রতিদিন দেখতাম কবিকে। কথা বলতাম। তাঁর সঙ্গ পেতাম। মনে পড়ে, জাতীয় কবিতা উৎসবের সেই সন্ধ্যায় স্বৈরচারী এরশাদের বিরুদ্ধে সমস্ত কবিকুল শব্দে শব্দে সোচ্চার, তখন মঞ্চে আসরের সভাপতিত্ব করছেন পটুয়া কামরুল হাসান। তিনি বসে বসে আঁকছিলেন সেই বিখ্যাত স্কেচ 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার কবলে' এবং তখনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর দর্শক সারিতে ছিলেন কবিতাপ্রেমী শেখ হাসিনা, যাঁর পাশেই ছিলেন নন্দিত কবি শামসুর রাহমান।

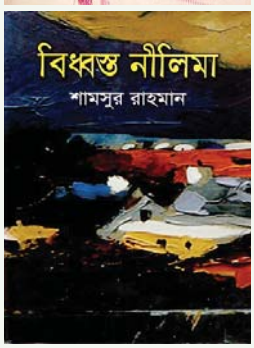

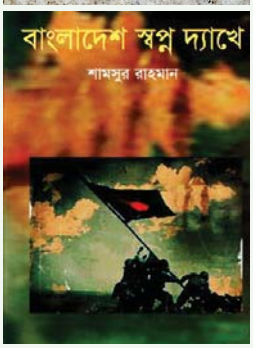

কবির কর্মস্থল *দৈনিক বাংলায়* কয়েকবার গিয়েছি। বাংলা কবিতার আরেক দিকপাল কবি আহসান হাবীবের যোগ্য উত্তরসূরি সত্তরের অন্যতম কবি নাসির আহমেদ সে সময় *দৈনিক বাংলার* সাহিত্য-সম্পাদক। লেখা নিয়ে নাসির ভাইয়ের কাছে গেলেই যাওয়া হতো রাহমান ভাইয়ের কক্ষে। কর্মে নিষ্ঠাবান কবি কখনো বিরক্তবোধ করতেন না। বরং ফাঁক পেলেই নিজের কবিতা শুনাতেন। কবির সঙ্গে অনেক স্মৃতি আছে আমার। নব্বইয়ের গোঁড়াতে একবার ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়ায় কবিতা পড়তে গিয়েছিলাম। প্রগতিশীল অনেক কবি, বলার অপেক্ষা রাখে না, কবিদের সেই যাত্রার মধ্যমণি ছিলেন শামসুর রাহমান। নদী যমুনা পাড় হয়ে, নদী মধুমতীর তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে জাতির পিতার পুণ্যভূমিতে কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে কবিতা পড়তে যাওয়া সবচেয়ে কনিষ্ঠতম কবি হিসেবে আমার সেদিন আনন্দের সীমা ছিল না।

কবি শামসুর রাহমানের *স্মৃতিকথা* লেখার শুরুটা হয়েছিল আমার মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে। আমি তখন *পূর্ণতা সাহিত্য* পত্রিকার দায়িত্বে ছিলাম। সম্পাদকের প্রস্তাব অনুযায়ী রাহমান ভাইকে অনুরোধ করলে, তিনি *স্মৃতিকথা* লিখতে শুরু করলেন। তিন কিস্তি লেখা ছাপা হবার পর আমি, কবি ফারুক মাহমুদের কারণে *পূর্ণতা* ছেড়ে দিলে রাহমান ভাইয়ের *স্মৃতিকথা* লেখা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে কবি নাসির আহমেদ সম্পাদনায় *জনকণ্ঠের* সাময়িকীতে 'কালের ধুলোয় লেখা' শিরোনামে সেই *স্মৃতিকথা* প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে *বৈঠা* নামে একটি লোকনন্দন বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদনা করছি, যার প্রথম সংখ্যার বিষয় ছিল– জ্যোৎস্না, যাতে কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন জ্যোৎস্না বিষয়ক তাঁর নান্দনিক অনুভূতি। *বৈঠার* দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের চেষ্টা চালাচ্ছি। বিষয়– 'বৃষ্টি'। জ্যোৎস্নার মতো বৃষ্টি নিয়েও একটি লেখার জন্য তাঁকে বলেছিলাম। গদ্য না লিখে লিখেছিলেন বৃষ্টির কবিতা। বললাম, কবিতা না, বৃষ্টি বিষয়ক গদ্য চাই। পুত্রবধূ টিয়ার মাধ্যমে জানালেন, দিবেন। না, আর দিবেন না। দিতে পারবেন না। কখনো না, কোনোদিনই না...।

বাড়িয়ে বলছি না, শুধু কবি, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কবির শুভানুধ্যায়ী ছাড়া কবির শেষ জীবনের দিনগুলোতে কেউ এগিয়ে আসেননি তাঁর সাংসারিক কষ্ট দূর করতে। বিভিন্ন লেখার সম্মানীর চেক নিয়ে অনেকদিন গিয়েছি তাঁর বাসায়। চেক পেয়ে খুশি হয়েছেন কিন্তু একটি চেক আনতে পারিনি বাংলাদেশ বেতার থেকে, যে চেকটি তাঁর গানের সম্মানীর চেক ছিল। মনে আছে, একসাথে কবি শামসুর রাহমান, কবি নাসির আহমেদ ও কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের বেতারে প্রচারিত গানের রয়েলিটির চেক আনতে গিয়ে আনতে পারিনি। কর্তৃপক্ষ বলেছে, গীতিকারকে আসতে হবে। কিন্তু শামসুর রাহমানের পক্ষে নিজে এসে চেক নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এই চেক শামসুর রাহমান কোনোদিন পাবেন কি না জানি না, কিন্তু আমি তাঁকে চেকটি কোনোদিন পৌঁছাতে পারব না।

প্রায় সকলেই জানেন, *দৈনিক বাংলার* চাকরি ছাড়বার পর প্রায় ২০ বছর কর্মহীন থেকে শুধু লেখালেখি করে জীবন ও সংসার চালিয়েছেন কবি। লেখালেখির সম্মানীই ছিল তাঁর একমাত্র উপার্জন। যাঁকে বলি বাংলার কবিতার প্রধান স্তম্ভ, তাঁকে অর্থকষ্টে কাটাতে হয়েছে জীবন। যিনি দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য আর বাংলার কবিতার জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁর সংসার এখন চলবে কীভাবে? যিনি দিয়ে গেছেন অনেক কিন্তু পেয়েছেন শূন্য। সংসার থাকল অর্থকষ্টের মধ্যে ডুবে আর কবি পেলেন শুধু মানুষের ভালোবাসা। তাই বলছি,

> কিছু মনে করবেন না শামসুর রাহমান/ রক্তখচিত সবুজ জমিনের স্বাধীন পতাকা/ আপনারে শরীরে বিছিয়ে দ্যায় নি যারা/ তারাই মনে মনে ছোট হয়ে থাকবেন সারাজীবন/ 'দুঃখিনী বর্ণমালা', 'আসাদের শার্ট', 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা'/ আর 'স্বাধীনতা তুমি' এমন অজর, অমর কবিতার কর্তা–/ আপনি নিজেই পতাকা, সার্বভৌম কবি/ রাষ্ট্র নয়, বাংলাদেশ আপনাকে বুকের গভীরে রেখে দিয়েছে যক্ষের ধনের মতো/ আপনাকে মনে রেখেছেন মেঘনা তীরের/ পাড়াতলি গ্রাম, বুড়িগঙ্গার তীরের ঢাকা/ আর হাজার নদীর-বিধৌত বাংলাদেশ।

কবি বলেছেন,

> যাবার সময় বস্তুত কারো
> দোষত্রুটি আমি ধরিনি;
> বৈরী ঋতুতে কোমল তাকায়
> চর্যাপদের হরিণী।

যে *চর্যাপদের* কবিতা দিয়ে বাংলা কবিতার শুরু, সেই বাংলা কবিতায় বিশাল অবদান রেখে গেছেন কবি শামসুর রাহমান।

২

ঢাকা নগর চারশো বছর অতিক্রম করেছে, আর এই নগরে কবি শামসুর রাহমান অতিবাহিত করেছেন সাতাত্তর বছর। এই শহর একাত্তরে শত্রু কবলিত হলে তিনি মাত্র কিছুদিন স্বনির্বাসিত হন। তাঁর নিজের ভাষায়: 'পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞের পর নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে ছুটে গিয়েছিলাম এক গণ্ডগ্রামে আমাদের নিজেদের গ্রামে।'

ঢাকার অদূরে মেঘনা নদীতীরবর্তী আদি পুরুষের এই গ্রামের কথা কবি তাঁর 'নায়কের ছায়া' কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

...পাড়াতলি
গ্রাম, নদী চিরে জেগে ওঠা, গাছপালা, ইদারা পুকুর হাট
বাজার নিঝুম গোরস্তান নিয়ে আছে। তাকে মেঘনার অঞ্জলি
বলা যায়।

একাত্তরের মার্চ থেকে মধ্য মে– এই সময়কাল নিজ গ্রামে আদি ভিটায় আশ্রয় শেষে তাঁর স্মৃতির শহর ঢাকায় ফিরে কবি বলেন, 'দেড় মাস পর ফিরে এসে দেখি, ঢাকা শহরের পথঘাট প্রায় ফাঁকা, রাস্তায় খুব কমই লোকজন দেখা যায়, চেনা মুখের সন্ধান পাওয়া ভার। শুধু নিরুপায় যারা, শুধু তারাই বেরোন পথে জীবিকার তাগিদে জরুরি সামগ্রী সংগ্রহের আশায়।' মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লিখিত সময় বাদে কবি শামসুর রাহমান তাঁর জীবনের পুরো সময়ই কাটিয়েছেন শহর ঢাকায়। অতিবাহিত জীবনে শামসুর রাহমান অবলোকন করেছেন এই শহরের প্রকৃতি, নিসর্গ, বৃক্ষ, ফুল, পাখি, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, খাবারদাবার, মানুষ আর মানুষের মানসিক, জৈবিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা উত্থান-পতন, অধীনতা-স্বাধীনতা। আর এসব ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিজের অভিজ্ঞতাকে ধীরে ধীরে শানিত করেছেন এবং কবিতায় সেই শানিত অভিজ্ঞতাকে মেলে ধরেছেন। শাহরিক শামসুর রাহমানের কবিতা পরতে পরতে পাওয়া যাবে তাই নগর বা শহরের চিত্র। ষাটের দশকের ঢাকার চিত্র তুলে এনেছেন শামসুর রাহমান তাঁর *বিধ্বস্ত নীলিমা* কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতায়। এই কবিতায় দারিদ্রপীড়িত মানুষের কথা আছে। উদ্ধৃতি:

...কোনোমতে
কাকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছিঁড়ছে রুটি ক'দিনের বাসি,
নড়বড়ে
পাঁচিলের ধার ঘেঁষে কাকগুলি পাখা ঝাপটায়
নগরের সুবিশাল নীলপক্ষ ঘড়ির আয়না।

পরের চরণেই শহরের চিত্র আরও অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে:

নিমিষেই সমস্ত শহর দেখবো কি করে হয়ে যায় ফণিমনসার
বন...।
[কবিতার অন্তপুর : *বিধ্বস্ত নীলিমা*]

না, ফণিমনসার বন দেখতে চেয়েও কবি পরে মত পালটিয়েছেন। কারণ কাঁটার জঙ্গল বা বন নয়, ফুলের বন চেয়ে তিনি পরবর্তীতে বলেছেন,

যারা মাঝ রাস্তা দিয়ে ভাগ্রের ছ্যাকড়া গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে
বড়ো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি সম্প্রতি আমরাই
শহরে বাগান চাই লিরিকের প্রসন্নতা ছাওয়া।
[সম্পাদক সমীপে: *বিধ্বস্ত নীলিমা*]

'ঢাকা' তখন 'ব্যস্ত ঢাকা' হয়ে ওঠেনি। ঢাকার গায়ে তখনও আছে স্নিগ্ধ-শ্যামল রূপ। কবিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে সেই রূপ-মাধুর্যে সাড়া দিতে। 'বৃষ্টির দিনে' কবিতায়:

কোথায় ছুটেছো, তুমি হন্তদন্ত হয়ে পরিশ্রমী নাগরিক এমন বর্ষায়
বরং পার্কের বেঞ্চে সময় কাটাই চলো কথোপকথনে
চলো পার্কে বৃষ্টির আদর মাখি চোখে মুখে, সেখানে তুমিও
সুস্নাত গাছের সখ্য পাবে, হাওয়ার অশ্রান্ত ম্যান্ডোলীন শুনে
...বর্ষায় নিমগ্ন হও, নিসর্গকে করো তীর্থভূমি।

কিন্তু ঢাকার নিসর্গ ও প্রকৃতি ক্রমে হারিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ঢাকা শহরে মানুষের ভিড় বেড়েছে, ব্যস্ততা বেড়েছে, হরেকরকমের মানুষও দেখা দিয়েছে। শামসুর রাহমান তাঁর 'বামনের দেশে' কবিতায় বলেছেন,

এ শহর চতুর্দিকে ভিড় চতুর্দিকে
বামনেরা জটলা পাকায়।

তাই কখনো কখনো আপন শহর ছেড়ে রৌদ্র আর বৃষ্টি কবি স্বেচ্ছায় চলে যেতে চান। বলেন,

ইচ্ছে হয় এ শহর ছেড়ে চলে যাই
থাক এই চেনা গলিপথ
প্রবীণ বসতবাড়ি থাক
অনেক পিছনে পড়ে।

কিন্তু নাড়িপোতা শহর ছেড়ে কবি যেতে পারেন না কিছুতেই। বলেন,

এ শহর মাতৃগর্ভ যেন
আঁধারের রহস্যময় প্রাচীন তারার স্বপ্নে দয়ালু উজ্জ্বল
নৈকট্যের স্মৃতিতে উষ্ণ চিরকাল। বুঝি তাই ফিরে আসি
বারবার তেতো হয়ে আসা চুরুটটা মুখে চেপে।
[এ শহর ঢাকাতেই: *নিরালোকে দিব্যরথ*]

শহরের বিভিন্ন রূপ আছে। যে রূপের গভীরে লুকিয়ে থাকেন কবি নিজে। গরমকালে শহরও উত্তপ্ত হয়। কবির বর্ণনায়:

ক'দিন থেকে শহর বদরাগী
ড্রাগন যেন, দুপুর হলে চড়া
হাওয়ায় ছোড়ে হল্কা আগুনের।
সত্তাময় দারুণ ধু-ধু খরা।
[গ্রীষ্মে তার নিজের কথা: *নিরালোকে দিব্যরথ*]

কবির প্রিয় শহর একাত্তরে শত্রু কবলিত হয়েছিল। পাকিস্তানিদের হাতে শাসিত, শোষিত, যুদ্ধকবলিত পরাধীন শহরের মুক্তি কামনা করেছেন কবি। কবিতায় উচ্চারণ করেছেন:

তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা
শহরের বুকে জলপাই রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে...
[তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা : *বন্দী শিবির থেকে*]।

অসংখ্য মানুষের সাথে কবি নিজেও বন্দি অবরুদ্ধ হয়ে আছেন তাঁর প্রিয় শহরে।

শত্রুরা শহরকে দলিত মথিত করছে, ধ্বংস ও হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে। 'পথের কুকুর' কবিতায় কবি বলেছেন,

...সমস্ত শহর সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে
কামান
এবং চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র। মরছে মানুষ
পথেঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী
ঠাঁই বসে আছি
সেই কবে থেকে।
[*বন্দী শিবির থেকে*]

এই বন্দিদশা, অসহ্য যন্ত্রণা, দুঃসহ পীড়ন থেকে মুক্তির খোঁজে শহর ছেড়ে মানুষ চলে যাচ্ছে গোপনে পালিয়ে। কবির চোখে সেই দৃশ্য:

মৌচাকে আগুন দিলে যেমন সশব্দে
সাধের আশ্রয়ত্যাগী হয়
মৌমাছির ঝাঁক
তেমনি সবাই পালাচ্ছে শহর ছেড়ে দিগ্বিদিক।
নবজাতককে বুকে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত জননী
বনপোড়া হরিণীর মতো যাচ্ছে ছুটে।
[তুমি বলেছিলে: *বন্দী শিবির থেকে*]।

যুদ্ধ শেষ। রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ যুদ্ধ। বিজয় এসেছে, নতুন পতাকা হয়েছে, কিন্তু প্রিয় মানুষকে হারিয়ে এই শহর কাঁদছে, কবিও। 'রক্তাক্ত প্রান্তরে' কবিতায় শামসুর রাহমানের উচ্চারণ তাঁর প্রিয় মুনীর ভাইকে (অর্থাৎ মুনীর চৌধুরী) নিয়ে–

এখন বিজয়ানন্দে হাসছে আমার বাংলাদেশ
লাল চেলী গায়ে, কী উদ্দাম। গমগমে
রাস্তাগুলো সারাক্ষণ উজ্জ্বল বুদবুদময়।
শুধু আপনাকে হ্যাঁ, আপনাকে মুনীর ভাই
ডাইনে অথবা বায়ে, কোথাও পাচ্ছি না খুঁজে আজ।
আপনার গলার চিহ্নিত স্বরে কেন
এ শহরে প্রকাশ্য উৎসবে
শুনতে পাবো না আর?
[*বন্দী শিবির থেকে*]।

'সান্ধ্য আইন' কবিতায় যুদ্ধোত্তর নির্জন, বিষাদগ্রস্ত শহরের বর্ণনা দিয়ে কবি উচ্চারণ করছেন:

এ শহরে কি আজ কেউ নেই? কেউ নেই?
এইতো প্রতিটি নীরব বারান্দায়
বিষাদ দাঁড়ানো কবির মতন একা।
[*বন্দী শিবির থেকে*]।

পরবর্তী 'উদ্বাস্তু' কবিতায় নিজের চেনা শহরের জন্য কষ্টের মাত্রা আরও প্রখর হয়েছে কবির। বলেছেন,

আমি কি কখোনো জানতাম এত দ্রুত
শহরের চেনা দৃশ্যাবলী লুপ্ত হয়ে যাবে?
[বন্দী শিবির থেকে]।

নিজের শহরেই কবি কাকে যেন খোঁজেন। কোনো অন্তর্হিতা কে? কেন খোঁজেন। খুঁজে পান কি? কবির ভাষায়:

শহরের প্রতিটি বাড়ির কড়া নেড়ে
এ রোদ্রামে, যে কোন মার্কেটে
সকল ঘুপচি কোনে তন্নতন্ন করে,
খুঁজে দেখতে অত্যন্ত লোভ হলো।
স্বচক্ষে দেখতে চাই তুমি আছো কি-না
অন্তরালে লুকিয়ে কোথাও।
[তুমি অন্তর্হিতা: *দুঃসময়ের মুখোমুখি*]

কবি তাঁর শহরের যাদেরকে হারিয়েছেন সেই তাদের জন্য করতে চান অনেক কিছু। অসংখ্য মৃত্যু ব্যথায় কাতর কবির উচ্চারণ:

চলুন শামিল হই আজ শোক মিছিলে সবাই
পথে মেলি কালো বস্ত্র 'ভিক্ষা দাও পুরবাসী' বলে
শহরে উঠুক বেজে শোকাতুর হারমোনিয়াম।
[আসুন আমরা আজ: *দুঃসময়ের মুখোমুখি*]।

৩

যুদ্ধোত্তর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। এই ঢাকার জীবন শুরু হলো। মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিলো। কবি শামসুর রাহমানও নতুন নতুন পঙ্‌ক্তিমালার বিধৃত করলেন মহানগরকে। 'বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে' কবিতায় আছে:

মধ্যরাত্রির শহরে একা সুনীল জাহাজ
সহজে প্রবেশ করে, নাবিকেরা গাঙচিল হয়ে
কলোনীর বাণিজ্যিক এলাকায় ছাদে ছাদে ওড়ে
একজন অন্ধ, ক্রুর বণিকের হাতে বাজ পাখি
নগর পুলিশ অর্ফিয়ুস না কি বলে কেউ কেউ
করোটিতে তবলা বাজায়। তরুণ কবিরও।
[*বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*]।

শামসুর রাহমানের কবিতায় শহরের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও কাব্যিক ভাষায়। কবি বর্ণনা করেছেন:

স্ট্রিটকার নর্তকির মতো ক্ষিপ্র মুদ্রায় চঞ্চল চৌরাস্তায়
পুলিশের হাতে কিছু সজীব গোলাম গান গায়, গান গায়
ভিখিরী বালক রুক্ষ ফুটপাতে একটি দুঃখিত কবিতা
পংক্তির মতন এক দুর্দশার ছায়ায় ঘুমায়।

শহর বললেই রেস্তোরাঁর প্রসঙ্গ আসে। শহরের রেস্তোরাঁয় বসে যুবকেরা আড্ডা দেয়। তরুণ কবিরাও। সে সময় এমনকি এখনও এই রীতি চালু আছে। শামসুর রাহমান সে সময়ের কথা বলেছেন:

ওরা কী যে বলাবলি করেছিল সেদিন সন্ধ্যায়
রেস্তোরাঁ, মনে নেই: শুধু মনে পড়ে প্রত্যেকেই
বলেছিল সবাইকে যেতে হবে, কেন যেতে হবে?
[রেস্তোরাঁর একটি টেবিলে: *বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে*]।

শামসুর রাহমানের নগর বিষয়ক কবিতাতেও আছে প্রেম। কারণ প্রেম বিচ্ছিন্ন কিছু নয়– না মানুষের কাছে, না কবির কাছে। যেমন কবির 'তুমি'-'তিনি'ও থাকেন কবির শহরেই। 'তুমি' কেন মনে করে শামসুর রাহমানের উচ্চারণ:

ভেবেছিলাম ঠিক তুমি আছো তুমি তো আছোই
এ শহরে যেমন পুণ্য আলো থাকে
গীর্জায় পূর্ণ মহিমাং।
[তুমি আছো: *আমরা ক'জন সঙ্গী*]।

৪

কবি বসবাস করেছেন শহর ঢাকাতেই। জন্মেছিলেন মাহুতটুলিতে। সেখানেই শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলো কাটিয়েছেন। এখনও থাকছেন এই শহরেই। 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' কবিতায় বলেছেন:

বাচ্চা তুমি, বাচ্চু তুই, চলে যাও চলে যা সেখানে
ছেচল্লিশ মাহুতটুলির খোলা ছাদে...
চকবাজারের ঘিঞ্জি গলির কিনারে
ম্যাজিকঅলার খেলা দেখেছি মোহন সন্ধ্যেবেলা
তোর মনে নেই?

উল্লেখ্য যে, শামসুর রাহমানের ডাক নাম 'বাচ্চু'। এই বাচ্চু অর্থাৎ শামসুর রাহমান নিজেই জানালেন:

চল্লিশের দশকের গোধূলিতে কবিতার সঙ্গে বলা যায়
আমার ঘনিষ্ঠ জীবন যাপন হলো শুরু।
[*কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি*]।

হ্যাঁ, সেই যে শুরু আর থামেননি। নগরের আলো-বাতাসে বেড়ে উঠেছেন আর নিরন্তর বাস করেছেন কবিতার সঙ্গে; কবিতা, কবিতা আর কবিতার সঙ্গে। যে কথা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নগর শামসুর রাহমানের কবিতার প্রধান ক্ষেত্র, প্রধান বিষয়। উল্লিখিত আলোচনা থেকেই তাঁর কবিতার নগর চেতনার প্রমাণ কিছুটা হলেও মেলে। কিন্তু শামসুর রাহমান কেবলমাত্র নাগরিক কবি অভিধায় সীমাবদ্ধ নন, তিনি সমগ্র বাংলা কবিতার প্রধানতম পুরুষ। শামসুর রাহমান দশক অতিক্রম করে এখন শতকের পরিক্রমায় হাঁটছেন। তাঁর কবিতা বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের মন জয় করেছে শুরু থেকেই এবং এখনও করছে।

ড. শিহাব শাহরিয়ার: কবি, প্রাবন্ধিক, গবেষক ও কিপার, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা

একুশ শতকের সাক্ষরতা ভাবনা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

সাক্ষরতা হলো পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লেখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। অর্থাৎ সাক্ষরতা বলতে লিখতে, পড়তে, গণনা করতে ও যোগাযোগ স্থাপন করার সক্ষমতাকে বোঝায়। এর সঙ্গে নতুন যুক্ত হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করতে জানা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এ বছরের পরিসংখ্যান মতে, দেশের মোট জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬। এর মধ্যে ৮ কোটি ১৭ লাখ পুরুষ ও ৮ কোটি ৩৩ লাখ নারী আর ১২ হাজার ৬২৯ জন তৃতীয় লিঙ্গ। প্রতিবেদনে সাক্ষরতার হারের হিসাবে বলা হয়, দেশের নারী-পুরুষ মিলে মোট সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ।

সাক্ষরতার হার নিয়ে তুলনামূলক একটা চিত্র দেখা যেতে পারে–

ক্র.	দেশের নাম	সাক্ষরতার হার	পুরুষের সাক্ষরতার হার	নারীর সাক্ষরতার হার	বৈষম্য
১.	পাকিস্তান	৫৫%	৬৭%	৪২%	২৫%
২.	নেপাল	৬৬%	৭৫.১%	৫৭.৪%	১৭.৭%
৩.	মালদ্বীপ	৯৯%	৯৯%	৯৯%	০%
৪.	ভারত	৭৪.৪%	৮২.১%	৬৫.৫%	১৬.৬%
৫.	বাংলাদেশ	৭৪.৬৬%	৭৬.৫৬%	৭২.৮২%	৩.৭৪%
৬.	জাপান	৯৯%	৯৯%	৯৯%	০%

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ১৯৭১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ দশমিক ৮ ভাগ। ১৯৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫ দশমিক ৩ এবং ২০০১ সালে ৪৭ দশমিক ৯। ২০০৮ সালে ৪৮ দশমিক ৮ ভাগ এবং ২০০৯ সালের হিসাবে ৫৩ ভাগ। ২০১০ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। ২০২২ সালে এ হার ৭৫ দশমিক ৬ শতাংশ ছুঁয়েছে বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন।

এ বছরের প্রতিবেদনে আরও দেখানো হয়েছে, গ্রামের চেয়ে শহরে সাক্ষরতার হার বেশি। জনশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী, পল্লি এলাকার মোট সাক্ষরতার হার ৭১ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৭৩ দশমিক ২৯ শতাংশ, নারীদের সাক্ষরতার হার ৬৯ দশমিক ৯৩ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৫১ দশমিক ৯৭ শতাংশ। এছাড়া শহর এলাকায় মোট সাক্ষরতার হার ৮১ দশমিক ২৮ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষের সাক্ষরতার হার ৮৩ দশমিক ১৮ শতাংশ, নারীদের ৭৯ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সাক্ষরতার হার ৫৫ দশমিক ২৮ শতাংশ।

২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতাহারে আওয়ামী লীগের ঘোষণা ছিল ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। ২০১০ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে। সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি সাড়ে ১২ লাখ। সরকারি হিসাবে এক বছরে দেশে সাক্ষরতার হার বেড়েছে দশমিক ৯ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো: 'ট্রান্সফরমিং লিটারেসি লারনিং স্পেসেস'– যা বাংলায় 'সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার'। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছরের সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

দেশের চার ভাগের এক ভাগ লোক এখনও নিরক্ষর–এ দায়ভার কার বা কীভাবে শতভাগ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা সম্ভব? বিগত ৫০ বছরের চেষ্টার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ৯৯% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সরকারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজ থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী, পুরাতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীকে দায়িত্ব নিতে হবে পুরোভাগে। সরকারি সাহায্য, বেতন, অনুদান ইত্যাদি পেতে হলে তার পরিধিতে থাকা নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে স্বউদ্যোগে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণও একটি বড়ো চ্যাপ্টার। যে-কোনো পর্যায়ে নমিনেশন পেতে হলে শর্ত হিসেবে নিজের এলাকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করতে হবে।

এক্ষেত্রে সফল হয়েছে বিশ্বের এমন দেশগুলোর অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে। আমি যতটুকু জানি বিশ্বের অনেক দেশেই সরকারি চাকরিবাকরি, সুযোগ-সুবিধা নিতে গেলে ওই ব্যক্তি কর্তৃক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সামনে আনা হয়। যেমন ধরুন, একজন চাকরিপ্রার্থী। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে এ চাকরি বা সুবিধার জন্য সামাজিক কী কী দায়িত্ব পালন করেছে? সে কাউকে শিক্ষিত করতে বা কোনো বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করতে বা কোনো চ্যারিটি কাজে যুক্ত আছে কি না? সরকারি সুবিধা গ্রহণেচ্ছু যে-কোনো ব্যক্তি বা সংস্থাকে এমন জায়গায় দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে। সামাজিক সংগঠনগুলোর নিবন্ধনে এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকারি/বেসরকারি চাকরির পদোন্নতিতেও বিষয়টা বাধ্যতামূলক করা যায়। অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের নাগরিককে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নিজ উদ্যোগে পাড়াপ্রতিবেশীকে অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে। বাসার বা কারখানার শ্রমিককে শিক্ষিত করার দায়িত্ব মালিককেই গ্রহণ করতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সামাজিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে আঁধার থেকে আলোতে উদ্ভাসিত হোক– এটাই আজকের প্রত্যাশা।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা, Faruque_dewan@yahoo.com

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন– পিআইডি

অপচয়কৃত খাদ্যের সঠিক ব্যবহার: সমস্যা থেকে সম্ভাবনা

ড. মো. খুরশিদুল জাহিদ

১৬ই অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে দিনটি। এ বছর খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য– 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়। ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং উন্নত জীবন'। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিষ্ঠার তারিখকে স্মরণ করে দিবসটি পালন করা হয়। দিনটি ক্ষুধা ও খাদ্য নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনেক সংস্থা দ্বারা ব্যাপকভাবে পালন করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং কৃষি উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিল। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ২০২০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে তাদের ক্ষুধা মোকাবিলায় প্রচেষ্টার জন্য, সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তিতে অবদান রাখার জন্য এবং যুদ্ধ ও সংঘাতের জন্য একটি অস্ত্র আকারে ক্ষুধার ব্যবহার বন্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার জন্য।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও দিবসটি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশে পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণীতে বলেন, দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়। ভালো উৎপাদনে উত্তম পুষ্টি, সুরক্ষিত পরিবেশ এবং উন্নত জীবন' বর্তমান সংকটাপূর্ণ বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বাণীতে বলেন, বর্তমানে মহামারি, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী দেখা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।

মহামারি ও যুদ্ধের প্রভাবে ২০২৩ সালে বিশ্বে দুর্ভিক্ষের যে আভাস মিলেছে, সেটি থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি খাবারের অপচয় না করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৭ই অক্টোবর রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস' উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি আবারও অনুরোধ করছি, কোনো খাদ্যের অপচয় নয়। খাদ্য উৎপাদন বাড়ান। যার যেখানে যতটুকু জমি আছে বাড়ান। সারা বিশ্বে যে দুর্যোগের ঘনঘটার আভাস আমরা পাচ্ছি, তার থেকে বাংলাদেশকে সুরক্ষিত করুন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নিজের খাবার নিজেরা উৎপাদন করার চেষ্টা করবেন, যাতে পরিবেশের উপর চাপ কমে, বাজারের উপর চাপ কমে এবং সকলে মিলে আমরা কাজ করলে অবশ্যই আমাদের বাংলাদেশের কোনোরকম আঘাত আসবে না। আমি বিশ্বাস করি সকলের প্রচেষ্টায় এটা করা সম্ভব।

তার সরকার পুষ্টিকর খাদ্য, সুষম খাদ্য, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে চায়, যা কেবল দেশে নয়, পুরো বিশ্বের মানুষেরই প্রয়োজন। কাজেই যত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি, আর যত বেশি খাদ্য চাহিদা মেটাতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি, জানান প্রধানমন্ত্রী।

কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, কৃষি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশ্ব খাদ্য দিবস ও কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টা নিয়ে একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল [মোট জনগোষ্ঠী ১৬৫১৫৮৬১৬[১] ও কৃষিনির্ভর দেশ [৭০.১% জমি কৃষিকাজে নিয়োজিত[২]]। বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রধান প্রধান কৃষিপণ্যগুলো হচ্ছে– ধান, পাট, গম, চা, তেলবীজ, সবজি ও ফল[২]। প্রতিবছর বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ক্রমেই বেড়ে চলেছে [খাদ্য উৎপাদন সূচক ১১২.২, ২০২০[৩]]। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল, ইলিশ মাছ, সবজি, আম, আলু, পেয়ারা, কাঁঠাল, ইত্যাদি উৎপাদনে বিশ্বে

যথাক্রমে ৩য়, ১ম, ৩য়, ৭ম, ৭ম, ৮ম, ২য় স্থান অর্জন করেছে[৪,৫,৬]। এ অর্জন আমাদের সবার। যা সম্ভব হয়েছে সরকার কর্তৃক গৃহীত সময়োপযোগী খাদ্য ও কৃষিনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কারণে।

প্রতিবছর সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে অনেক খাদ্য নষ্ট অথবা অপচয় হয়ে থাকে। ব্যক্তি পর্যায়ের তুলনায় অনেক গুণ খাদ্য সামগ্রিকভাবে নষ্ট অথবা অপচয় হয়ে থাকে [৬৫ কেজি/জন/বছর; ১০৬১৮২৩৩ টন/গৃহ/বছর[৭]]। অপচয়কৃত খাদ্য খুব সহজেই মানুষ, পশুপাখি, মাছ ইত্যাদির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিদেনপক্ষে সার ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং কৃষকসহ অনেকেই সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। ফলশ্রুতিতে খাদ্য ও পুষ্টির জোগান দেওয়া সহজ ও লাভজনক হবে। সর্বোপরি দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

খাদ্যের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে [জনসংখ্যা বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার: ১.২২[১]]। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও অনেক সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে খাদ্যের জোগান ও ব্যবস্থাপনায় অনেক সময় বর্ধিত জনগোষ্ঠীকে বোঝা হিসেবে মনে হয়। তাই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে এখনই বাংলাদেশের স্বার্থকে সমুন্নত রেখে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সঠিক বাস্তবায়ন অতি জরুরি।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে খাদ্যে অপচয় রোধের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা সহজ ও সহনীয় হবে অনেকাংশে।

১. জনগণের অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে,

২. খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং যত্ন বিষয়ক সঠিক জ্ঞান জনগণকে বিতরণ করতে হবে,

৩. সঠিক জ্ঞান (ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি) প্রয়োগ করে খাদ্যের অপচয় কমাতে ও অপচয়কৃত খাদ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে,

৪. দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে হবে,

৫. খাদ্য সংরক্ষণ সুবিধা সহজলভ্য ও বৃদ্ধি করতে হবে (ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে),

৬. খাদ্য সংরক্ষণ ও অপচয় রোধে সময়োপযোগী গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে,

৭. মৌসুমি খাদ্যের অভাব সম্পর্কে আগাম সতর্কতা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে,

৮. নির্দিষ্ট কিছু দেশের ওপর নির্ভরতা কমাতে হবে। সাথে সাথে বিকল্প জোগান তৈরি করতে হবে– যা দাম সাশ্রয়ে সহায়ক ভূমিকা রাখবে,

৯. খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইনের সঠিক ও কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে,

১০. সর্বোপরি, সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খাদ্যের (দেশে উৎপাদিত/আমদানিকৃত, কাঁচা/রান্না ইত্যাদি) অপচয় রোধ করতে হবে।

সুষম খাদ্য নিশ্চিতের পাশাপাশি বাংলাদেশকে বৈচিত্র্যময় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতিও নজর দিতে হবে। এটা এখন সময়ের দাবি। খাদ্য সংকট মোকাবিলায় তাই খাদ্যের অপচয় রোধ এবং অপচয়কৃত খাদ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি জরুরি। সঠিক ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বাংলাদেশি জনগণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা পূরণ করতে পারবে অনেকাংশে।

তথ্যসূত্র

১। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, www.bbs,gov.bd

২। FAO, 2022

৩। Bangladesh Food production index, 1960-2021 - knoema.com

৪। Bangladesh: Ranks third, globally, in the production of freshwater fish – ICSF

৫। Bangladesh now 3rd in global rice production: PM... (daily-bangladesh.com)

৬। Bangladesh ranks 3rd in global rice production... (daily-bangladesh.com)

৭। UNEP FOOD WASTE INDEX REPORT 2021.

ড. মো. খুরশিদুল জাহিদ: সহযোগী অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঁচটি উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ১৯শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের সদর উপজেলা থেকে ময়মনসিংহের সদর, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ঈশ্বরগঞ্জ ও তারাকান্দা উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন উদ্‌বোধন করেন। এ উপলক্ষে ময়মনসিংহের সদর উপজেলায় আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন এবং নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ায় আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধারা এখন ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। এছাড়া অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০ হাজার বীর নিবাস নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধারা বিনামূল্যে হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন জানিয়ে তিনি বলেন, জেলা, উপজেলাসহ দেশের বিশেষায়িত হাসপাতালে চিকিৎসা, ওষুধ, টেস্ট যা প্রয়োজন সবই বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংসদ সদস্য ফকরুল ইমাম ও কাজিম উদ্দিন আহমেদ ধনু, ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মাছুম আহাম্মদ ভূঞা, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট জহিরুল হক খোকাসহ ময়মনসিংহ সদর উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধা নেতৃবৃন্দ সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, ঈশ্বরগঞ্জ ও তারাকান্দা উপজেলার বীর মুক্তিযোদ্ধারা ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিলেন।

প্রতিবেদন: মুবিন হক

শিশু উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদান

রহিম আব্দুর রহিম

একটি পরিবারের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিবারপ্রধানের। আর একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দ্বার উন্মুক্ত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, নিরাপত্তাসহ স্বাভাবিক জীবনমান নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। বাংলাদেশের সরকারপ্রধান বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা এমন একজন চিন্তানায়ক, যিনি একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে নিবেদিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যিনি শিশুদের প্রায় অনুষ্ঠানের সমাপনী ভাষণে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' কবিতার অংশ– 'এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান/জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে/চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল/এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'– উচ্চারণ করে থাকেন। তাঁর অঙ্গীকার কথার কথা নয়, বাস্তবতার পরিধিও বিশাল।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'– এই বাক্যটি যেভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, বঙ্গবন্ধু ব্যতীত অন্য কোনো সরকারপ্রধান ততটা উপলব্ধি করেছেন বলে কোনো প্রমাণ মেলে না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আঞ্চলিক কমিটির সভায় অটিজম বিষয়ক পার্শ্ব ইভেন্টের প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন, 'অটিজম আক্রান্তরা কোনোভাবেই আমাদের বোঝা নয়, বিশ্বমানের অনেক মনীষী আছেন, যাঁরা এই সমস্যায় আক্রান্ত। সঠিক পরিচর্যা ও সমাজের সহানুভূতি ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে বাংলাদেশের অনেকেই নিজেদের সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।' তিনি তাঁর এই বিশ্বাস বাস্তবে রূপ দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। অটিজম শিশুদের জন্য সমাজের সম-অধিকার, শিক্ষা, সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে, তাদের পরিচর্যার জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার ধারাবাহিকতা তাঁরই অবদান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান, তিনি সকল শিশুদের অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩, দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন ২০২১, শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করেছেন। উল্লেখ্য, শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিকভাবে জাতিসংঘ ১৯৮৯ সালে শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করেন। জাতিসংঘের এই আইনের ১৫ বছর পূর্বে ১৯৭৪ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু আইন প্রণয়ন করে বিশ্ব দরবারে শিশুপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছিলেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনা নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

শিশুর শৈশব নিশ্চিতকরণে শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টার অকাট্য প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা *রচনাসমগ্র: ০১*-এর একটি উক্তিতে। তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমার জন্ম হয়েছে গ্রামে, শৈশবের রঙিন দিনগুলো উপভোগ করেছি গ্রামে। গ্রামীণ স্বভাব, চালচলন, জীবনযাত্রা ও মানসিকতার সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক।' হ্যাঁ, এই গ্রামবাংলার প্রকৃতি, মাটি ও মানুষের আপনজন শেখ হাসিনা শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ক্রীড়া বিনোদনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার আওতায় প্রাথমিকের ছেলেশিশুদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ' এবং মেয়েশিশুদের জন্য 'বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ' চালু করে সর্বস্তরের শিশুদের জন্য উন্মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। শারীরিক, মানসিক উন্নয়নে শিশুর 'শৈশব' শিশুদের কাছে ফেরাতে শেখ হাসিনা অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মে যা বলেছেন, তা কোনো সাধারণ বক্তব্য নয়, স্পষ্টত এক শৈশবপ্রিয় গবেষকের কথা। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে যুক্ত হয়ে বলেন, 'খেলাধুলা যে-কোনো ধরনের ভুল পথে যাওয়া বন্ধ করার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে সহায়ক। জাতি গঠনে এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' তিনি ঘরে আবদ্ধ যান্ত্রিক আসক্ত শিশুদের ব্যাপারে বলেন, 'আমাদের বেশিরভাগ শিশু প্রায় সময় ফ্ল্যাটে মোবাইল, ল্যাপটপ ও আইপ্যাড নিয়ে সময় কাটাচ্ছে। এটা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই অমঙ্গলজনক'। শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য তিনি অভিভাবকদের বলেন, 'কিছু সময়ের জন্য হলেও শিশুদের বাইরে গিয়ে মাঠে খেলাধুলা ও দৌড়ঝাঁপ করার সুযোগ দিতে হবে। আমি অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের শিশুদের লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার প্রতিও মনোযোগী হবেন।' ঐ দিন তিনি রাজধানীর খেলাধুলার মাঠ কম উল্লেখ করে বলেন, 'আমরা কিছুটা উদ্যোগ নিয়েছি প্রতিটি এলাকাতেই যেন খেলার মাঠ থাকে, যেখানে খালি জায়গা পাচ্ছি খেলার মাঠ করে দিচ্ছি। সংসদ ভবনের পাশে বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের খেলাধুলার জন্য একটি একাডেমি নির্মাণ করে দেওয়া হচ্ছে।'

১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা প্রথম সরকার গঠনের পর বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের অলিম্পিকে আমেরিকা থেকে ৭২টি পদক জয়ের গৌরব অর্জন করেছে, এক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান সরকারপ্রধানের পৃষ্ঠপোষকতায় অটিস্টিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা বিভিন্ন স্পেশাল অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে ২১৬টি স্বর্ণ, ১০৯টি রৌপ্য ও ৮৪টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই শিশুদের খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ১২৫টি উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করে এক

বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি শিশুদের শৈশবকালের বিলুপ্তপ্রায় গ্রামীণ খেলা পুনরায় উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, সাঁতার, হকিসহ বিভিন্ন খেলার পাশাপাশি দেশীয় খেলাগুলো যেমন ডাঙুলি, গোল্লাছুট থেকে শুরু করে যেসব খেলা প্রচলিত ছিল, সেগুলো আবার চালু করতে হবে।' শিশুর শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে আন্তরিকতার সাথে শেখ হাসিনা সরকার প্রথম থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। অবলা, অবুঝ শিশুদের মানসিক চাপ কমাতে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নামক ভীতি দূর করে শিক্ষানীতি প্রণয়নও করেছেন যা ২০২৩ সাল থেকে বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, পরিত্যক্ত শিশুদের সেবা ও ভাতা প্রদান, পথশিশুদের পুনর্বাসন, তাদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারপ্রধান ব্যক্তিগত নজরদারিতে রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। শিশুর শিক্ষা ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে মিড ডে মিল, শিশুর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এর আওতাভুক্ত। উল্লেখ্য, শিশুর পুষ্টি ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রায় ১১ লাখ মাকে মাতৃত্বকালীন ল্যাকটেটিং ও মাদার ভাতা প্রদান শেখ হাসিনারই অবদান। হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র কার্যক্রম প্রসার এবং চা বাগান ও গার্মেন্টসকর্মীর শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন ও তা পরিচালনা উল্লেখযোগ্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে জাতির ভবিষ্যৎ শিশুদের যোগ্য করে তুলতে চান বলেই তিনি শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে এতটা উদার। দার্শনিকের ভাষায়– 'তুমি যদি মাসব্যাপী ফল ভোগ করতে চাও, তবে ফসল কর/তুমি যদি বছরব্যাপী ফল ভোগ করতে চাও, তবে বৃক্ষরোপণ কর/আর যদি শতাব্দীব্যাপী ফল ভোগ করতে চাও, তবে মানুষের চাষ কর।' প্রধানমন্ত্রী দার্শনিকের এই বাণী প্রতিষ্ঠায় মানব চাষের কাঁচা উপকরণ শিশুদের জীবনমান উন্নত করতে দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। মায়ের বুকের দুধই শিশুর মুখ্য খাদ্য হলেও, বাণিজ্যিকভাবে শিশুর বাড়তি খাদ্য ও ব্যবহার সরঞ্জামাদি বিপণন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৩ প্রণয়ন করে তিনি শিশুদের পরম বন্ধু হওয়ার দক্ষতা অর্জন করেছেন। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১৩-২০২৫ প্রণয়ন করেন, যা বাস্তবায়ন করার পদক্ষেপ তিনিই নিয়েছেন। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা এবং শিশুরা যাতে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সকল প্রকার অধিকার ও বিনোদন সমানভাবে ভোগ করতে পারে সে কারণেই শেখ হাসিনা বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন ২০১৮ প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করছেন। প্রায় পরিবারের শিশুরাই বাবা-মায়ের ইচ্ছার বাইরে কিছুই করতে পারে না। এক্ষেত্রে মেয়েশিশুরা তুলনামূলকভাবে অধিকতর ভুক্তভোগী। বাল্য বয়সেই তাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। বর্তমান সরকারপ্রধান তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলেই বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় পরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন করেছেন। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০২০ প্রণয়ন করে শেখ হাসিনা নারী ও শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শেখ হাসিনাই শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, সুন্দর করার সকল প্রকার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন।

শিক্ষাদীক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী জনগোষ্ঠী গঠন করতে হলে যে শিশুর উন্নয়নই পূর্বশর্ত, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা তাঁর প্রায় বক্তব্যেই প্রকাশ করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় 'হৃদয়ে পিতৃভূমি' শীর্ষক আলোচনায় শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন, 'শিশুদের জন্য আমরা একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে দিয়ে যেতে চাই। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এ মর্যাদা ধরে রেখেই আগামী দিনের বাংলাদেশকে আমরা উন্নত ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলবো– এটাই আমাদের অঙ্গীকার, আজকের শিশুরাই হবে আগামী দিনের কর্ণধার।' ঐ দিনের আলোচনায় তিনি আরও বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য শিশুরা সুরক্ষিত থাকবে, সুন্দর জীবন পাবে। তাই জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর শিশুদের উন্নয়নের জন্য বহু প্রাইমারি স্কুল জাতীয়করণসহ আমরা নানা ব্যবস্থা নেই।' তাঁর পুরো বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, শেখ হাসিনা ও তাঁর সরকার একটি টেকসই জাতি গঠনে বদ্ধপরিকর আর এ জাতি গঠনের স্তম্ভই শিশুর উন্নয়ন। শেখ হাসিনা সরকারই সর্বপ্রথম এ স্বাধীন দেশের সর্বস্তরের শিশুদের শিক্ষা সহজলভ্য করায় বছরের শুরুতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্য বইয়ের ঘ্রাণ শিশুরা পাচ্ছে। এছাড়াও দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শিশুরা পাচ্ছে উপবৃত্তি। 'মা বাঁচলে শিশু বাঁচবে'– এই স্লোগানে মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ও কর্মজীবীদের ছুটির ব্যবস্থা করেছেন বর্তমান সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মনেপ্রাণে, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনায় একজন শিশুবান্ধব মানুষ ও রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর প্রমাণ মেলে ১৯৮৮ সালের লেখা 'ওরা টোকাই কেন?' প্রবন্ধে। যেখানে তিনি আক্ষেপ ভরে উল্লেখ করেন, 'রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে যারা যুক্ত– সরকারি আমলা, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, বুদ্ধিজীবী সমাজের যে যেখানে অবস্থান করছেন, যখনই বক্তৃতা দেবার সুযোগ পাচ্ছেন তখনই বলছেন– শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই শিশুরা, যাদের জন্ম, বেঁচে থাকা, বড় হওয়া সবই ফুটপাথে, ডাস্টবিনে তাদের ভবিষ্যৎ কী?।' শিশু উন্নয়নে শেখ হাসিনার অবদান অনস্বীকার্য।

১৪ই মে ২০২২ বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তন থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম 'বাংলাদেশ আরলি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক' (বেন) আয়োজিত জাতীয় ইসিডি সম্মেলনের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, সুষ্ঠু শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশের জন্য শিশুদের জীবনের প্রথম আট বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে শিশুর শিক্ষা ও বিকাশের ভিত্তি রচিত হয়। শিশুর সঠিক প্রারম্ভিক বিকাশ মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ। একটি মেধাসম্পন্ন জাতি গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিশুবান্ধব সরকার শিশুর খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, সুরক্ষা ও শিক্ষা নিশ্চিত করছে। তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা সংবিধানে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। দেশ স্বাধীনের পর পরই শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যু রোধ এবং প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ ও কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে।

রহিম আব্দুর রহিম: শিক্ষক, গবেষক, কলামিস্ট, শিশুসংগঠক ও আন্তর্জাতিক পদকে ভূষিত নাট্যকার, bskt1967@gmail.com

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

কে সি বি তপু

বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী বড়ো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো জাতিসংঘ। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠার পর জাতিসংঘ সারা বিশ্বে শান্তি বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান গড়ে তোলা জাতিসংঘের অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনে বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি স্বাধীনতা। আর এ অর্জনের সুনিপুণ কারিগর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধু কেবল বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দেননি, তিনি বাঙালি জাতিকে একটি স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবেও বৈশ্বিক পরিচিতি দান করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী কূটনীতির ফলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর খুব স্বল্পকালের মধ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এর এক সপ্তাহ পরে ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন, যা এখনও মানবজাতিকে নাড়া দেয়। তিনি হয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল সরকার গঠনের পর এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বের জনমত ও রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায় করা। এ উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকারের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দলকে ১৯৭১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম অধিবেশনে প্রেরণ করা হয়। ১৯৭১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের দীর্ঘ বক্তব্য পাঠানো হয় এবং এটি নিরাপত্তা পরিষদের অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত হয়।

শরণার্থীদের সাহায্য প্রদানে জাতিসংঘ সক্রিয় ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অমানবিক নির্যাতন ও গণহত্যার কারণে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারতে বাংলাদেশি শরণার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালায়। বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ইউএনএইচসিআর ছাড়াও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, ইউনিসেফ প্রভৃতি জাতিসংঘ সংস্থা শরণার্থীদের জন্য কাজ শুরু করে। অন্যদিকে, তৎকালে অধিকৃত বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতা শুরু করে। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসক) আলোচ্যসূচিতেও বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা গুরুত্বপূর্ণভাবে উত্থাপিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘ বৃহৎ আকারের ত্রাণ এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়।

বাংলাদেশ-জাতিসংঘ সম্পর্ক আরও জোরদার হয় যখন ১৯৭৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম বাংলাদেশ সফরে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এ সফর দ্বারা জাতিসংঘ বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় সমর্থন দান করে। এ সময়ে জাতিসংঘের সহায়তায় যুদ্ধবিধ্বস্ত চালনা পোর্টে ডুবে যাওয়া জাহাজসমূহ অপসারণ করা হয়। এছাড়া ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালিদের ফিরিয়ে আনতেও জাতিসংঘ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সনদের আদর্শ ও নীতিমালার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের যে সংবিধান গৃহীত হয় তাতে এমন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও বাক্য রয়েছে, যা সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘের সনদ ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধানে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে: 'আন্তর্জাতিক আইন এবং জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা, এই সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি' (অনুচ্ছেদ-২৫)। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষক দল বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে তৎপরতা চালায়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময়ে পাকিস্তান সরকারের প্ররোচনায় নিরাপত্তা পরিষদে চীনের ভেটো প্রয়োগের কারণে পর পর দুবার বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে ব্যর্থ হয়।

বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে। এই ঘোষণা

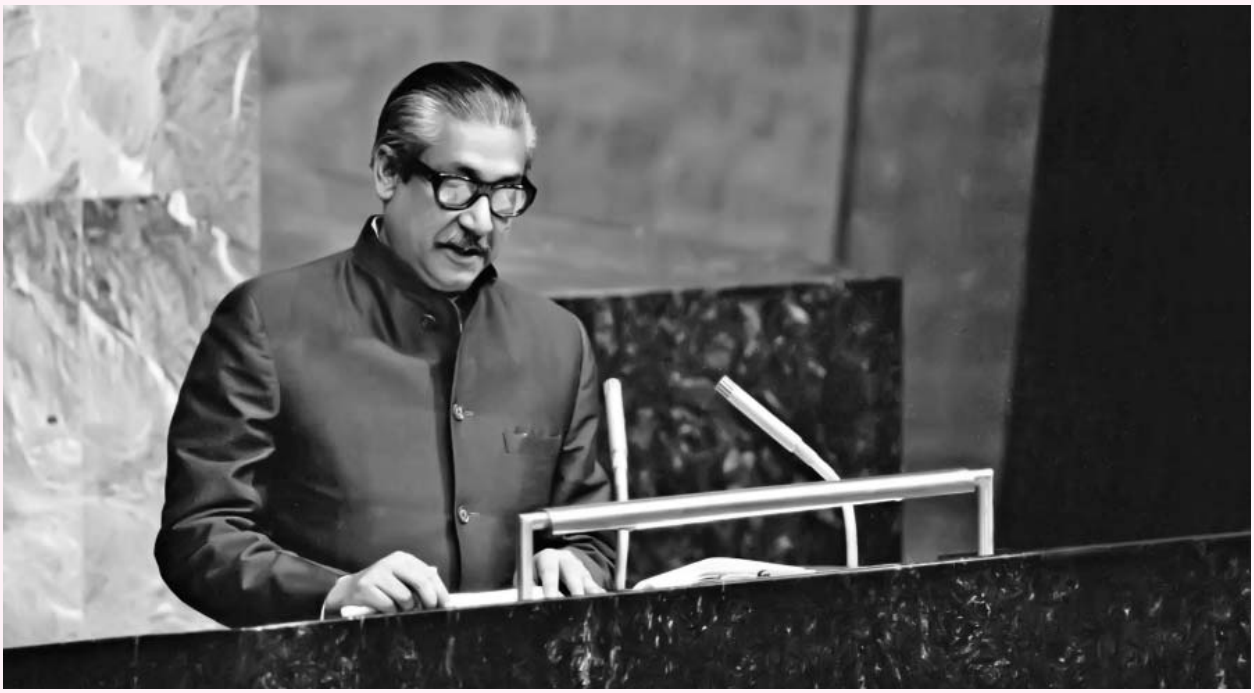

শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন, 'আমি সুখী হয়েছি যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘে তার ন্যায্য আসন লাভ করেছে। জাতি আজ গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে, যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।' [সূত্র: তোফায়েল আহমেদ, 'জাতিসংঘে জাতির পিতা', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২২] জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে যোগদানের এক সপ্তাহ পর ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সদ্য সদস্য পদপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা। বক্তৃতা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধুর নাম যখন ঘোষিত হয়, তখন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মুহুর্মুহু করতালিতে চারদিক মুখরিত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে চতুর্দিকে তাকিয়ে পরিষদে সমাগত বিশ্বনেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সর্বোচ্চ সংস্থা জাতিসংঘকে 'মানবজাতির মহান পার্লামেন্ট' উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাষ্ট্রনায়ক, যিনি মাতৃভাষা বাংলায় বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'শান্তি ও ন্যায়ের জন্য পৃথিবীর সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিমূর্ত হয়ে উঠবে এমন এক নয়া বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ আজ পূর্ণ অঙ্গীকারবদ্ধ।' [সূত্র : প্রাগুক্ত]

বঙ্গবন্ধু ভাষণের শুরুতেই বলেন, 'আজ এই মহামহিমান্বিত সমাবেশে দাঁড়াইয়া আপনাদের সাথে আমি এই জন্য পরিপূর্ণ সন্তুষ্টির ভাগীদার যে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এই পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পূর্ণতা চিহ্নিত করিয়া বাঙালি জাতির জন্য ইহা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার অর্জনের জন্য এবং একটি স্বাধীন দেশে মুক্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়া বাঁচার জন্য বাঙালি জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বের সকল জাতির সাথে শান্তি ও সৌহার্দ্য নিয়া বাস করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন।'

জাতিসংঘ সনদে মানবাধিকারসহ যেসব মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে, সেসবের উল্লেখ করে তিনি সেদিন বলেছিলেন, এসবই বাংলাদেশের জনগণের আদর্শ। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমর্থনের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'যাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিশ্ব-সমাজে স্থানলাভ করিয়াছে, এই সুযোগে আমি তাঁদেরকেও অভিবাদন জানাই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমর্থনদানকারী সকল দেশ ও জনগণের প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংহতকরণ, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন ও ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বাংলাদেশকে যাঁহারা মূল্যবান সাহায্য দিতেছেন, তাঁহাদেরকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই। জাতিসংঘে যাঁহারা আমাদের স্বাগত জানাইয়াছেন, তাঁহাদেরকে আমি বাংলাদেশের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং সে ভাষণে তিনি প্রায় ২৫টি ইস্যু তুলে ধরেন, যা এখনও মানবজাতিকে নাড়া দেয়। সেই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন, যা এখনও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'বাংলাদেশ প্রথম হইতেই শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করিয়া জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছে।' আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের নীতি হচ্ছে সবার প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিরূপ বা শত্রুতা নেই। তাঁর এ কালজয়ী নীতির ফলে বিশ্বসভায় বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানের ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে শান্তি ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জোরালো অঙ্গীকার করেন। সুখের বিষয়, তাঁর সে অঙ্গীকার আজ প্রতিপালিত হচ্ছে

সুনিপুণভাবে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি মিশনে এক নম্বরে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের প্রায় এক লাখ ৫৪ হাজার শান্তিরক্ষী নিয়োজিত এবং দেশ ও দশের জন্য তারা সুনাম বয়ে আনেন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সমঝোতা রক্ষায় বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে যে ভাষণ তিনি দিয়ে গেছেন, তা-ই প্রতিফলিত হচ্ছে আজ বাংলাদেশের অবস্থানে। তাঁর সুকন্যা, এ দেশের সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা উপমহাদেশে বাংলাদেশ আপোশ, ন্যায়নীতি, পরিপক্বতা ও সমঝোতার পররাষ্ট্রনীতি প্রচলন করেন।

জাতিসংঘের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা এবং সহযোগিতার ওপর জোর দেন। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ তা অর্জনের জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ অবস্থা জাতিসংঘে তুলে ধরেন এবং ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আনন্দের কথা হলো, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে দুর্যোগ মোকাবিলা করায় ১ নম্বর মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো দূর করার জন্য সব রাষ্ট্র, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মতো বড়ো বড়ো বাধা কারও পক্ষে এককভাবে পেরিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন সবচেয়ে টেকসই হয়। জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘে নানামুখী ভূমিকা রেখে চলেছে।

বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা ও বৈশ্বিক শান্তির অনুধাবন আজও বিশ্বব্যাপী আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে। সেই ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ সদর দপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বা 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। বঙ্গবন্ধুকে এ উপাধি প্রদান করে জাতিসংঘ নিজেদের ভাবমূর্তিই উজ্জ্বল করেছে। বাঙালির প্রাণপুরুষ আজ বিশ্বপ্রেরণার বাতিঘর। [ড. এ কে আব্দুল মোমেন, 'জাতিসংঘ, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু: ফিরে দেখা', *দৈনিক সমকাল*, ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৯]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাগানে একটি 'হানি লোকাস্ট' গাছের চারা রোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ জাতিসংঘ সদর দপ্তরের উত্তর লনে বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে তাঁর বাণীসংবলিত একটি বেঞ্চ উন্মুক্ত করেন এবং বৃক্ষরোপণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এটি একটি বিশেষ দিন। কারণ আমাদের যুদ্ধ বিজয়ের পর ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ১৭ই সেপ্টেম্বর স্বীকৃতি পাওয়ার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে আসেন এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তিনি (বঙ্গবন্ধু) ভাষণ দেন। সেই ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন বাংলা ভাষায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, একটি চেয়ার উৎসর্গ করা হলো, একটি বৃক্ষরোপণ করা হলো। বৃক্ষ পরিবেশও রক্ষা করে, মানুষকে খাদ্য দেয়, মানুষকে ছায়া দেয় এবং মানুষের জীবনকে রক্ষা করে। আর চেয়ারটার এটিই সবচেয়ে বড়ো বিষয় মানুষ এখানে শান্তিতে বসবে, কিছুক্ষণ আরাম করবে ও চিন্তা করবে।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর যে লক্ষ্য ছিল সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়– এটিই ছিল উনার জীবনের লক্ষ্য, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলা। কারণ তাতে শান্তি আসবে এবং শান্তির সন্ধানেই তিনি সবসময় ছিলেন, শান্তির জন্যই সংগ্রাম করেছেন।

বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা ছিল নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের উদার মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ, অপরদিকে মানবসভ্যতার কল্যাণে জাতিসংঘকে আরও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের জন্য বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বান। মানবজাতির সর্বোচ্চ পার্লামেন্ট জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ও সদস্যপদ অর্জনে বঙ্গবন্ধুর নিরলস কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু নন, বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অবস্থানকে সমুজ্জ্বল করেছেন তিনিই। আজও তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও পরিপুষ্ট করেছেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পথচলা হোক মসৃণ, ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ। এদেশের বৈশ্বিক নেতৃত্বও হোক সুদৃঢ়।

কে সি বি তপু: প্রাবন্ধিক ও গবেষক, kcbtopu@gmail.com

'বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা' স্মারক ডাকটিকিট উদ্‌বোধন

'জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ, বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা' (২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪–২৩শে সেপ্টেম্বর ২০২০) উদ্‌যাপন উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করা হয়েছে। এই উপলক্ষে ডাক অধিদপ্তর দশ টাকা মূল্যমানের একটি স্মারক ডাকটিকিট ছাড়াও দশ টাকা মূল্যমানের একটি উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত এবং পাঁচ টাকা মূল্যমানের একটি ডাটা কার্ড ও একটি বিশেষ সিলমোহর প্রকাশ করে। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় ডাক ভবন মিলনায়তনে স্মারক ডাকটিকিট ও উদ্‌বোধনী খাম অবমুক্ত করেন এবং ডাটা কার্ড ও সিলমোহর প্রকাশ করেন। সভায় মন্ত্রী তার বক্তৃতায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু এবং বাংলা টাইপ রাইটার যন্ত্র প্রবর্তনে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরেন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষার যে ভিত্তি রচনা করেছেন তা অসাধারণ। শুধু বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি হিসেবেই নয়, সেই সাথে বিশ্বের ৩৫ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান আমাদের জন্য বড়ো অহংকার বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিতার পথ ধরে কন্যার যে যাত্রা তা স্মরণীয় করে রাখতেই স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

প্রতিবেদন: নওশান আহমেদ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

ফারিহা হোসেন

মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহীত ১০টি উদ্যোগের একটি হচ্ছে শিক্ষা। এটা মনে রাখা দরকার যে, দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করতে হলে কাউকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বাদ রেখে সেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। মূলত এ কারণেই প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগের মধ্যে 'শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' নামে একটি কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এ কর্মসূচির আওতায় অর্থাভাবে শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনার সরকার দেশের সকল স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করে। এজন্য 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন' মন্ত্রিসভায় অনুমোদন দেওয়া হয়। এর আগে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল ২০১২' পাস হয়। সংবিধানের ৮০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি উক্ত বিলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন' গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই ট্রাস্ট ফান্ড থেকে শিক্ষা সহায়তা পেয়ে ইতোমধ্যে অনেক শিক্ষার্থী কর্মে, জীবিকার্জনের পথে নিজেদের নিয়োজিত করতে সমর্থ হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচ প্রকল্পের আওতায় দেশের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের মেয়াদ শেষে দেশের ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের সার্বিক উপবৃত্তি কার্যক্রম ট্রাস্ট-এর অর্থে পরিচালিত হবে। ট্রাস্টের অর্থে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। ট্রাস্ট থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ জন ছাত্রীকে মোট ৭২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি দেওয়া হয়। ৩০শে জুন ২০১৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শেখ হাসিনা স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১৫ জন ছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তি বিতরণের মাধ্যমে ট্রাস্ট-এর উপবৃত্তি কার্যক্রমের শুভ উদ্‌বোধন করেন। উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ১৪,৬৭৭ জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ জন ছাত্রীসহ মোট ১,৬৩,০৭৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ট্রাস্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ২০১৩ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী নির্বাচিত ৭৫ শতাংশ ছাত্রী ও ২৫ শতাংশ ছাত্রের মাঝে সর্বমোট ১৩ লাখ ৮৩ হাজার ৬০৯ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রায় ৭৯০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রাজস্ব খাত থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থীর হাতে উপবৃত্তির অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্যও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এলক্ষ্যে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান নির্দেশিকা ২০১৫-এর আলোকে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির আর্থিক সহায়তা বাবদ শিক্ষার্থী প্রতি মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫ হাজার টাকা, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৮ হাজার এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০ হাজার টাকা হারে ৯৭৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৮ লাখ ২৪ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়। এলক্ষ্যে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নির্দেশিকা ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদানের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এ নির্দেশিকার আলোকে ২০১৪-২০১৫ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান বাবদ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ৩১ জন ছাত্রছাত্রীকে ৭ লাখ ৫৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা তথা এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এজন্য প্রণীত নির্দেশিকা ২০১৭ অনুযায়ী ২০১৮ সাল থেকে এমফিল কোর্সে মাসিক ১০ হাজার টাকা এবং পিএইচডি কোর্সে মাসিক ১৫ হাজার টাকা করে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান হচ্ছে। এমফিল/পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হওয়া যে-কোনো গবেষক গবেষণাকর্ম সম্পাদনে ঐ ফেলোশিপ ও বৃত্তি পেতে পারেন। এ পর্যন্ত ১৫ জন এমফিল গবেষককে সর্বমোট ২০ লাখ ৪০ হাজার টাকা এবং ১৪ জন পিএইচডি গবেষককে সর্বমোট ১৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়েছে। ট্রাস্ট আইনের বিধান অনুযায়ী ৫ সদস্য বিশিষ্ট ট্রাস্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এ আইনের উপ-ধারা অনুযায়ী ২৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিগত ১২ বছরেরও অধিক সময় পরে যুগান্তকারী পরিবর্তনের মূলে রয়েছে শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই দেওয়া, প্রায় সব শিশুকে স্কুলমুখী করানো, মাধ্যমিক পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের সমতা অর্জন, উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, দর্শন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

মূলত ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সব মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানুষের বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। একইসঙ্গে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচির মধ্যে ছিল– স্কুলে যাওয়া শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ, মেয়েদের বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ এবং শিক্ষা সহায়তা উপবৃত্তি প্রদান, সব শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি প্রদান, পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করা এবং আইটিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনসহ শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ।

অন্যদিকে, ২০০৯ সাল থেকে প্রায় শতভাগ স্কুলে মিড ডে মিল চালু হওয়ায় প্রাথমিকে শিশু ভর্তির হার বৃদ্ধি, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাঁচটি প্রকল্পের আওতায় ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে স্নাতক পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী এবং প্রাথমিকে শতভাগ শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট এবং মাধ্যমিক শিক্ষা খাত উন্নয়ন প্রকল্প নামে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রকল্প চালু আছে। এ পর্যন্ত প্রথম থেকে ডিগ্রি পর্যন্ত মোট ১ কোটি ২২ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এক সময় নারী শিক্ষা ছিল শুধু উচ্চবিত্ত ও শহরের কিছু পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সেই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি, বই ক্রয়, ফরম পূরণসহ অন্যান্য খরচের জন্য বিজ্ঞান, মানবিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আর্থিকভাবে উপবৃত্তি দেওয়া হবে। অর্থের অভাবে কারও লেখাপড়া যেন বন্ধ না হয়ে যায়, সে বিষয়টি সরকার নিশ্চিত করতে চায়। যে পর্যন্ত সকলে শতভাগ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারবে ততদিন পর্যন্ত এ প্রকল্পটি চলমান থাকবে। এ প্রকল্পটি চলমান থাকলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ড্রপআউটের হার অনেকটাই কমে আসবে। নিয়মিত পড়ালেখা চালিয়ে যেতে শুধু দরিদ্র শিক্ষার্থী নয়, প্রতিবন্ধী, এতিম, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতিনাতনি, নদীভাঙন কবলিত এবং দুস্থ পরিবারের সন্তানদেরও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার ব্যবহার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের তথ্য রেকর্ড করা হয় এবং পরবর্তীতে এ অনুযায়ী কাজ করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট প্রথম স্থান অর্জন করেছে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে। ট্রাস্টের নানামুখী পদক্ষেপের মাঝে ট্রাস্ট তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ, উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ, ট্রাস্টের সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ, ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ, ট্রাস্টের অধীন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ, শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ, সব পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণসহ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত এবং উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ও পিএইচডি কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ দেওয়াসহ নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, এতিম, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান, নদীভাঙন কবলিত পরিবারের সন্তান এবং দুস্থ পরিবারের সন্তানগণ উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গের সকল শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্য হবে এবং এদের তালিকা পৃথকভাবে প্রেরণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫,০০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৮,০০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০,০০০ টাকা হারে ভর্তি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ এখন একটি উন্নয়নশীল দেশ। একটি দেশের সার্বিকভাবে উন্নয়ন তখন হয়, যখন দেশের উভয় শ্রেণির মানুষ তথা নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যায়। নারী শিক্ষা ও কর্মের এই ব্যাপক অগ্রগতির পেছনে অবদান রয়েছে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার। নারী শিক্ষার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সারা দেশে পোস্টার ছাপিয়ে তা জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকল্পে কর্মশালা আয়োজন চলমান রয়েছে। অপেক্ষাকৃত কম সময়ে উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট চালু করেছে ই-সেবা। সরকারি ও বেসরকারি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করে উপবৃত্তির অর্থ ইএফটি-মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এবং টিউশন ফির অর্থ অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করতে চালু রয়েছে সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি। সরকারি ও বেসরকারি সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করে উপবৃত্তির অর্থ ইএফটি-মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এবং টিউশন ফির অর্থ অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান নিশ্চিত করতে চালু আছে ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর কার্যক্রম আরও ব্যাপক হবে, এটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি। উন্নত-সমৃদ্ধ জাতি গঠনে, টেকসই উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বঙ্গবন্ধু স্কলার নামে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ এমফিল কোর্সে মাসিক ১০ হাজার টাকা হারে দুবছর মেয়াদে এবং পিএইচডি কোর্সে মাসিক ১৫ হাজার টাকা হারে তিন বছর মেয়াদে ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল উপর্যুক্ত সহায়তা ছাড়াও শিক্ষার্থীদের জরুরি প্রয়োজনে চাহিদার নিরিখে বিশেষ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল গঠন করে চালু করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ। মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য দেশের মধ্যে সব সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৩টি অধিক্ষেত্রের (সামাজিক বিজ্ঞান, কলা ও মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, আইন, ভৌত বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি, বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, শিক্ষা ও উন্নয়ন, চিকিৎসা, চারুকারু, কৃষি বিজ্ঞান এবং মাদ্রাসা শিক্ষা) প্রত্যেক অধিক্ষেত্রে একজন করে ১৩ জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু স্কলার হিসেবে নির্বাচন করে সম্মাননা স্বরূপ এককালীন তিন লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট পে-চেক, একটি সার্টিফিকেট ও একটি ক্রেস্ট প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি অনলাইনভিত্তিক সেবাদান কার্যক্রম এবং ভেরিফিকেশনে কাজ করছেন কর্মকর্তারা। প্রত্যাশা থাকবে দেশের দরিদ্র, অসহায় পরিবারের সন্তান এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণের স্বপ্নপূরণ, শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের আলোকিত করার, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও আস্থার জায়গা হয়ে উঠবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট।

ফারিহা হোসেন: ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমেস্ট্রি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিষয়ে অধ্যয়নরত

মৎস্য চাষে অগ্রগতি

ডা. নূরল হক

'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দুই বছর পর কুমিল্লায় এক জনসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাছ হবে দ্বিতীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ– এই মর্মে ঘোষণা দেন। আজ বাংলাদেশ মৎস্য ও মৎস্যজাত সম্পদ রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। শুধু তাই নয়, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আমিষের ৬০ শতাংশ জোগান দেয় মাছ।

বাংলাদেশ এখন মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তথ্য মতে, ১৯৮৩-১৯৮৪ অর্থবছরে মাছের মোট উৎপাদন ছিল ৭.৫৪ লাখ মেট্রিক টন। ৩৭ বছরের ব্যবধানে ২০২০-২০২১ সালে এ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৬.২১ লাখ মেট্রিক টন অর্থাৎ এ সময়ের ব্যবধানে মোট মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় সাড়ে ছয় গুণের কাছাকাছি। সরকারের বাস্তবমুখী কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ এখন মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মৎস্যজাত উৎস থেকে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য খাতে এ অনন্য সফলতা ধরে রাখার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এগুলো হলো–জাটকা সংরক্ষণ ও ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সহনশীল আহরণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মাছ সরবরাহ এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি।

২০২২ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার এক প্রতিবেদন অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর দূষণের কারণে বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে স্বাদু পানির মাছের উৎপাদন কমেছে। চাষের মাছের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এর মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হিসেবে স্বাদু পানির মাছের উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং চাষের মাছ উৎপাদনেও বাংলাদেশ একই অবস্থানে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, স্বাদু পানির পাখনাযুক্ত মাছ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থান। এসব মাছের মধ্যে ইলিশও রয়েছে। ইলিশ মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম অবস্থানে।

মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে অন্যতম ভূমিকা রাখছে ইলিশ মাছ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৪ লাখ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়। সর্বশেষ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এর উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৫৬ লাখ মেট্রিক টনে। অধিদপ্তরের হিসাবে গত অর্থবছরে দেশে উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশই ছিল ইলিশ। ইলিশ মাছ উৎপাদন বাড়ার কারণ হিসেবে বিগত কয়েক বছর ধরে ইলিশ রক্ষায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, কোস্টগার্ড, পুলিশ ও নৌবাহিনী সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। সবার সহযোগিতায় বিশেষ অভিযানও পরিচালনা করা হয়। এতে জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষা পাওয়ার কারণেই ইলিশের উৎপাদন বাড়ছে।

বিগত পাঁচ বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন নদনদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপন করার ফলে মাছের উৎপাদন ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্তপ্রায় এবং বিপন্ন ও দুর্লভ প্রজাতির মাছ যথা– টেরিপুঁটি, মেনি, চিতল, ফলি, বামোস, কালিবাউশ, আইড়, টেংরা, স্বরপুঁটি, মধু পাবদা, রিঠা, কাজলী, চাকা, গজার, বাইন ইত্যাদি প্রজাতির মাছের প্রাপ্তি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অভয়াশ্রমে দেশি কই, শিং, মাগুর, পাবদা ইত্যাদি মাছের পোনা ছাড়ার ফলে এসব মাছের প্রাচুর্যও বেড়েছে। গবেষণার মাধ্যমে এই জাতের মাছ এখন চাষ হচ্ছে।

দেশে বিপুল পরিমাণ পাঙাশ, তেলাপিয়া ও রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বেড়েছে। এখন শিক্ষিত তরুণেরা চাকরির দিকে না ঝুঁকে মাছ চাষে আগ্রহী হচ্ছে। এছাড়া ব্যাংকগুলো মৎস্য উৎপাদনে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার ফলে মাছ চাষের দিকে মানুষ ঝুঁকেছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত সম্পদ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। ২০১৯-২০২০ সালে ৭০,৯৪৫.৩৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩ হাজার ৯৮৫.১৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। বর্তমানে এ সেক্টরে প্রায় ১৪ লক্ষাধিক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত থেকে জীবিকানির্বাহ করছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ অনুসারে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৫০% মৎস্য খাতের অবদান রয়েছে। দেশের মোট কৃষি আয়ের ২৫.৭২% আসে মৎস্য থেকে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

ডা. নূরল হক: চিকিৎসক ও সাংবাদিক

শারদীয় দুর্গাপূজা

সাবিত্রী রানী

বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নাম দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব। বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা মহা ধুমধামের সাথে এ উৎসব পালন করে থাকে। এ পূজা সর্বজনীন। দেবী দুর্গা আমাদের মাঝে মাতৃরূপে বিরাজ করেন। অশুভ শক্তির বিনাশ এবং সত্য ও সুন্দরের আরাধনা শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেবী দুর্গা হলেন শক্তির রূপ। তিনি আদ্যাশক্তি। দুর্গা মহামায়া, শিবানী, ভবানী, দশভুজা, সিংহবাহনা ইত্যাদি নামে অভিহিত হন। দুর্গ বা দুর্গম নামক দৈত্যকে বধ করেন বলে তাঁর নাম হয় দুর্গা। জীবের দুর্গতিনাশ করেন বলেও তাঁকে দুর্গা বলা হয়। শরৎকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা এবং এ পূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব। পক্ষান্তরে বসন্তকালে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা বাসন্তী পূজা নামে অভিহিত। বাসন্তী পূজা এখনও প্রচলিত থাকলেও শারদীয় দুর্গাপূজা আবহমানকাল থেকে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে অনেক সময় পঞ্জিকা অনুযায়ী কার্তিক মাসেও দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরাণে দেখা যায়, একদা মহিষাসুরের ভক্তি ও তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। মহিষাসুর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অমরত্বের বর প্রার্থনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মা সরাসরি অমরত্বে বর না দিয়ে বর দিলেন– কোনো পুরুষের হাতে তার মৃত্যু হবে না। অতঃপর মহিষাসুর অসুরকুলের রাজা হন এবং তার মনে বাসনা জাগে স্বর্গ-মর্ত্য জয় করার। অবধ্য মহিষাসুর দেবতাদের বিতারিত করে স্বর্গরাজ্য দখল করেন। নিরুপায় দেবতারা রাজ্যহারা হয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণুর নির্দেশে সকল দেবতার তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হয়ে দশভুজা এক নারী মূর্তির আবির্ভাব ঘটে, তিনিই হলেন দেবী দুর্গা। তারপর দেবী দুর্গাকে সুসজ্জিত করে দেওয়া হয় ১০টি মারণাস্ত্র দিয়ে। দেবতা শিব দিলেন ত্রিশুল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতারা দিলেন তীর-ধনুক, তরবারি, ঢাল, বিষধর সর্প, তীক্ষ্ণ কাঁটাওয়ালা শঙ্খ, বিদ্যুৎবাহী বজ্রশক্তি এবং একটি পদ্মফুল। এভাবে সুসজ্জিতা দেবী ১০ দিনব্যাপী যুদ্ধে মহিষাসুরকে বধ করেন। তাই দেবীর আরেক নাম মহিষাসুরমর্দিনী। মহিষাসুর বধের পরে দেবতারা স্বর্গরাজ্য ফিরে পেলেন এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি ফিরে এল।

দুর্গাপূজার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। হিন্দু *পুরাণে* দুর্গাপূজার সূচনা সম্পর্কে বিভিন্ন কাহিনি পাওয়া যায়। *শ্রীশ্রীচণ্ডী* বা *দেবী মাহাত্ম্য* গ্রন্থে বর্ণিত দুর্গা ও দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেবী দুর্গার কাহিনিগুলো সর্বাধিক জনপ্রিয়। *শ্রীশ্রীচণ্ডী* পাঠ দুর্গাপূজার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। *শ্রীশ্রীচণ্ডী* মার্কণ্ডেয় *পুরাণের* একটি নির্বাচিত অংশ। এতে তেরোটি অধ্যায়ে মোট সাতশটি শ্লোক আছে।

দুর্গাপূজার প্রচলন সম্পর্কে *পুরাণে* লিখিত হয়েছে যে, পুরাকালে রাজ্যহারা হয়ে রাজা সুরথ এবং স্বজন প্রতারিত সমাধি বৈশ্য একদিন মেধস মুনির আশ্রমে যান। সেখানে মুনির পরামর্শে তারা দেবী দুর্গার পূজা করেন। পূজায় তুষ্টা দেবীর বরে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

এ পূজা বসন্তকালে হয়েছিল বলে এর নাম 'বাসন্তী পূজা'। *কৃত্তিবাসী রামায়ণ* থেকে জানা যায় যে, রামচন্দ্র রাবণবধের জন্য এবং সীতা উদ্ধারের জন্য অকালে অর্থাৎ শরৎকালে দেবীর পূজা করেছিলেন। তখন থেকে এর নাম হয় অকালবোধন বা শারদীয় দুর্গাপূজা।

সচরাচর দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি দেখা যায় সেটি পরিবার সমন্বিতা। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর মুকুটের উপরে শিবের ছোটো মুখ; দেবীর ডান পাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নীচে গণেশ; বাম পাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নীচে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা অক্টোবর ২০২২ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শ্রী শ্রী ঢাকেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

কার্তিক। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সংলগ্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার এক বিশেষ মূর্তি দেখা যায়। সেখানে দেবীর ডান পাশে উপরে গণেশ ও নীচে লক্ষ্মী, বামে উপরে কার্তিক ও নীচে সরস্বতী এবং কাঠামোর উপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভ বাহন শিব ও দুপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কোথাও কোথাও দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তিও চোখে পড়ে। তবে দুর্গার কাঠামোগত বিন্যাসে যতই বৈচিত্র্য থাকুক দুর্গোৎসবে প্রায় সর্বত্রই দেবী দুর্গা সপরিবার পূজিত হন।

দুর্গাপূজা মূলত ১০ দিনের উৎসব। শুরু হয় দেবীপক্ষে। শুরুর পর্বের নাম মহালয়া। মহালয়াতে দেবী দুর্গাকে পিতৃলয়ে আহ্বান জানানো হয়। মহালয়ার পরে আসে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। এ ১০ দিনের মধ্যে মহালয়া এবং মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও দশমী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূজার এই কয়েকদিন সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রে মুখরিত হয়ে ওঠে। 'যা সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ/ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা/ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।' ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত একেক দিনে একেক রীতিতে দেবীর বন্দনা করা হয়। ষষ্ঠী পূজার দিনে দুর্গাপূজার এক মহাপর্ব। সন্ধ্যায় বিল্ববৃক্ষে বোধন আমন্ত্রণ অধিবাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ঐ সময় দেবীর মৃন্ময় প্রতিমায় অধিবাস করা হয়। পরদিন মহাসপ্তমী ভোরবেলায় বিল্ববৃক্ষ মূলে পূজাদি পর্ব করে নবপত্রিকা স্নান করানো হয়। নবপত্রিকাকে চলিত ভাষায় কলাবৌ বলে। নবপত্রিকা স্নান করিয়ে গণেশের পাশে স্থাপন করে যথাবিধি অনুযায়ী মহাসপ্তমী পূজা শেষ হয়। মহাঅষ্টমীর দিনে 'কুমারী পূজা' করা হয়। 'কুমারী পূজা' হলো তন্ত্রশাস্ত্র মতে অনধিক ষোলো বছরের অরজঃস্বলা কুমারী মেয়ের পূজা। এ মহাঅষ্টমীতে সন্ধিপূজাও করা হয়। এ পূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এই পূজা। যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সংযোগ স্থলে এই পূজা হয় তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা। অর্থাৎ সন্ধিকালীন পূজা। সন্ধিপূজার সমাপ্তি পর্ব থেকেই মহানবমী শুরু হয়; দেবীকে 'অন্নভোগ' সাজিয়ে দেওয়া হয়। ভক্তদের জন্য এ প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা থাকে। দেবী দুর্গার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বিজয়া দশমী শুরু হয়। আত্মশুদ্ধির মধ্য দিয়ে এই উৎসব সমাপ্ত হয়। এ দিনে বাঙালি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার প্রতিফলন ঘটে। যেমন– শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ধান-দূর্বা সমর্পণ, একে অপরের মিষ্টিমুখ করানো, দেবীর সিঁথিতে সিঁদুর পরানো এবং সর্বশেষ উলুধ্বনির মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে পরিবার-পরিজনসহ বিশ্বের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়। এই সিঁদুর খেলার মধ্য দিয়েই বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বাংলাদেশের পাড়া-মহল্লা থেকে শুরু করে সর্বত্রই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মহাসাড়ম্বরে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় এই উৎসব পালন করে থাকে।

সাবিত্রী রানী: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহকারী শিক্ষক, রাজধানী আইডিয়াল স্কুল, রামপুরা, ঢাকা

জাতীয় মানবকল্যাণ পদক

'মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক'-এর নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক' করা হয়েছে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২২ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট আইনের খসড়া এবং বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য একটি সহযোগিতা চুক্তির খসড়া দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালার নাম সংশোধনের একটা প্রস্তাব ছিল। এর আগে যখন পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল তখন মন্ত্রিসভা কমিটির সদস্যরা জানান, নামটা একটু পরিবর্তন করা দরকার। সেজন্য তারা তিনটি নাম নিয়ে আসেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বৈঠকে আলাপ-আলোচনা করে এটার নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় মানবকল্যাণ পদক ২০২২' করা হয়েছে। অনগ্রসর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং মিয়ানমারের ১১ লাখ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা বিশ্বে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর সেই উপাধি অনুসারেই এই পদকের প্রচলন করে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। নীতিমালা অনুযায়ী পদকের সংখ্যা হবে প্রতিবছর ব্যক্তি পর্যায়ে তিনটি এবং সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে দুটিসহ মোট পাঁচটি। পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংস্থাকে ১৮ ক্যারেট মানের ২৫ গ্রাম স্বর্ণের একটি পদক, পদকের একটি রেপ্লিকা, ২ লাখ টাকা ও একটি সম্মাননা সনদ দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন : উষা রাণী

পরিবেশ রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণ জরুরি

সৈয়দা অনন্যা রহমান

বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত প্রধান পণ্য তার দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারকারীদের প্রতি দুজনের একজনের প্রাণ কেড়ে নেয়। ফলে বিশ্বে বছরে চার মিলিয়নেরও অধিক মানুষ মৃত্যুবরণ করে।[১] ২০১৭-২০১৮ সালের তথ্যানুসারে, তামাকের কারণে বছরে এক লক্ষ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। তামাকজনিত রোগ ও অকাল মৃত্যুর কারণে বছরে ব্যয় হয় ৩০ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনা অত্যন্ত জরুরি।

শুধু জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, পরিবেশ সুরক্ষায়ও তামাকের ব্যবহার কমানো প্রয়োজন। তামাক কোম্পানি পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় পরিবেশ দূষণকারী।[২] প্রতিবছর তামাক চাষের কারণে বিশ্বে ৩.৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি ধ্বংস হচ্ছে। উজার হচ্ছে বন, মাটির উর্বরা শক্তি হ্রাস এবং ক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে বন উজারের প্রায় ৫% ঘটছে তামাকের কারণে।

পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়নে তামাকের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে তামাক নিয়ন্ত্রণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসডিজি-এর ১৭টি গোলের মধ্যে ১১টি গোল অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে তামাক। লক্ষ্যমাত্রাগুলো হচ্ছে– লক্ষ্যমাত্রা-১ দারিদ্র্য নির্মূল, লক্ষ্যমাত্রা-২ ক্ষুধামুক্তি, লক্ষ্যমাত্রা-৩ সুস্বাস্থ্য, লক্ষ্যমাত্রা-৪ মানসম্মত শিক্ষা, লক্ষ্যমাত্রা-৫ লিঙ্গ সমতা, লক্ষ্যমাত্রা-৬ নিরাপদ পানি, লক্ষ্যমাত্রা-৮ সকলের জন্য টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা, লক্ষ্যমাত্রা-১১ টেকসই শহর ও তার অধিবাসীদের নিরাপদ রাখা, লক্ষ্যমাত্রা-১৩ জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপ, লক্ষ্যমাত্রা-১৪ পানির নীচের প্রাণপ্রকৃতি এবং লক্ষ্যমাত্রা-১৫ স্থলভাগের জীবন।

বিশ্বব্যাপী তামাক সরবরাহ চেইন জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলছে। জলবায়ুর স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস, সম্পদের অপচয় এবং বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করার পরও পরিবেশ ধ্বংসকারী তামাক কোম্পানিগুলো পরিবেশ সুরক্ষায় নিজেদের অবদান রাখার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তামাক উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ পরিবেশগত দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ। তামাকপাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে কাঠের ব্যবহার গাছ কাটাকে উৎসাহিত করছে কারণ তামাকজাত পণ্যের প্যাকেজিং এবং সিগারেট মোড়ানোতে কাগজ ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক গবেষণা অনুসারে, বিশ্বব্যাপী ১.৭% বন উজার হওয়ার কারণ তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ। প্রতি ৩০০টি সিগারেট তৈরির জন্য তামাকপাতা প্রক্রিয়াজাতকরণে (১.৫ কার্টন) একটি গাছ প্রয়োজন হয়। প্রকৃতপক্ষে, তামাক চাষ এবং প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বছরে প্রায় ৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমি এবং ৮ মিলিয়ন থেকে ১১ মিলিয়ন টন কাঠ ব্যবহৃত হয়। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) হিসাবে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে ৪০,৪৭২ হেক্টর জমি তামাক চাষের অধীনে ছিল।

তামাক কোম্পানিগুলো কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) প্রকল্প এবং পরিবেশগত ক্ষতিকারক বিষয়গুলোকে 'greenwashing' (পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল ভাবমূর্তি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রচারকৃত মিথ্যা তথ্য) করতে নানা খাতে প্রচুর বিনিয়োগ করে। এ সকল খাতগুলোর মধ্যে রয়েছে– বৃক্ষরোপণ, সমুদ্রসৈকত পরিষ্কার, পরিবেশবান্ধব নতুন পণ্য বিপণন ইত্যাদি। ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ফিলিপস মরিচ ইন্টারন্যাশনাল (PMI) বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্প এবং তথাকথিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (CSR) পালনের জন্য ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ব্যয় করেছে।[৩]

বাংলাদেশেও তামাক কোম্পানিগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আড়ালে নীতিতে প্রভাব বিস্তারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। ব্যাবসা চালু রাখতে তামাক কোম্পানিগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি (সিএসআর), লবিং, অনুদান ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারসহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করছে।[৪] ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি ২০২১ সালে সিএসআর বাবদ ব্যয় করেছে সাড়ে ১২ কোটি টাকা এবং ব্যাংকগুলো এসময়কালে ব্যয় করেছে ৭৫৭ কোটি টাকা। অথচ প্রচারণার দিক থেকে তামাক কোম্পানিগুলো অনেক অগ্রসর।

প্রকৃতপক্ষে বড়ো বড়ো তামাক কোম্পানিগুলো তাদের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডগুলো থেকে নীতিনির্ধারক এবং জনগণের মনোযোগ সরানোর উদ্দেশ্যে এগুলো করে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা এবং কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক চুক্তির অসামঞ্জস্যতা এ সুযোগগুলো করে দেয়। উল্লেখ্য, ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) অনুসারে তামাকের প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞাপন, পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে তামাক কোম্পানি কর্তৃক সিএসআর কর্মসূচিগুলোও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে তামাক কোম্পানিগুলোর সিএসআর পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে কোম্পানির নাম, সাইন, ট্রেডমার্ক, প্রতীক ব্যবহারের

১ https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/Talking_Trash_BN_.pdf
২ https://exposetobacco.org/bn/bbt?utm_source=fca&utm_medium=email&utm_campaign=bbt
৩ https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/Talking_Trash_BN_.pdf
৪ https://www.newsbangla24.com/news/168759/Tobacco-company-calls-for-closure-of-CSR

ক্ষেত্রে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু কোম্পানিগুলো আইনের এ ধারা লঙ্ঘন করেই সিএসআর কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

তামাকজাত দ্রব্য তৈরির ফলে উৎপাদিত হচ্ছে বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য। টক্সিক রিলিজ ইনভেন্টরি ডেটাবেস অনুযায়ী, ২০০৮ সালে তামাক উৎপাদনকারী প্ল্যান্ট থেকে ৪,৫৬,০০০ কেজির বেশি বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গত হয়। ২০১১ সালে BAT তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, তামাক উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকালীন সময়ে ১,৯৭৩ মেট্রিক টন বিপজ্জনক বর্জ্য তৈরি হয়েছিল।

ধোঁয়াবিহীন তামাক বেশির ভাগই ছোটো প্লাস্টিকের পাউচে প্যাক করা হয় এবং প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ পাউচ তৈরি করা হয়। প্লাস্টিকের থলি বা পাউচে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার বেশ কয়েকটি দেশে এক ধরনের নতুন পরিবেশগত উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। ধোঁয়াবিহীন তামাক প্যাকেজিংয়ের জন্য প্লাস্টিকের পাউচ ব্যবহারের সমস্যা প্রাথমিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু গত এক দশকে বা তার পরে এটি একটি বিশ্বব্যাপী উদ্বেগ হয়ে উঠেছে।[৫] GATS অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২২ মিলিয়ন ।

ই-সিগারেটের বিপজ্জনক বর্জ্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের বিপন্ন করে তুলছে। এসব পণ্যের ধাতু, প্লাস্টিক ও ব্যাটারি বিশ্বের বর্জ্য/আবর্জনা বাড়িয়ে তুলছে।[৬] ধোঁয়াবিহীন তামাকের প্লাস্টিক পাউচ/প্যাকেটগুলো শহরের রাস্তা, ড্রেন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বন্ধ করার পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ পানি এবং পানি সরবরাহকে বিষাক্ত করে। যা পরোক্ষভাবে খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে।

ডিজেল গ্যাস একটি পরিচিত কার্সিনোজেন (মানব দেহে ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী উপাদান)। সিগারেটের ফিনিশড প্যাকেট ডিজেল চালিত ট্রাকের মাধ্যমে বিক্রয়ের স্থানে বহন করার কারণে এর সঙ্গে ব্যাপক পরিবহণ খরচ এবং পরিবেশ দূষণের বিষয়গুলো যুক্ত থাকে। এই রাসায়নিকগুলোর মধ্যে অনেকগুলো নিজেরাই পরিবেশগতভাবে বিষাক্ত এবং কমপক্ষে ৫০টি মানব কার্সিনোজেন হিসেবে পরিচিত।

সিগারেটের ফিল্টার পাঁচ থেকে সাত বছরের জন্য পচে না যা বড়ো ধরনের একটি পরিবেশগত বিপদ তৈরি করে। বিশ্বে প্রতিবছর ৪.৫ ট্রিলিয়ন সিগারেটের বর্জ্য ফেলা হয়। এগুলো ১.৬৯ বিলিয়ন পাউন্ড বিষাক্ত বর্জ্য তৈরি করে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ফেলা এবং সমুদ্রসৈকতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া বর্জ্য।[৭] সিগারেটের মধ্যে প্রায় ৭০০০ রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা শেষ পর্যন্ত মাটি ও জলে পড়ে জমা হয়। সিগারেটের বাট থেকে পাওয়া (Leachate) লিচেট কিছু সামুদ্রিক এবং স্বাদু পানির মাছের প্রজাতি এবং প্রাণীদের জন্য তীব্র বিষাক্ত। কিছু দেশে অনেক গরু, মহিষ রাস্তায় অবাধে ঘুরে বেড়ায় এবং আবর্জনা খায়। সিগারেটের বাট তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (GATS) ২০১৭ অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ১৫ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ধূমপায়ী। একজনের প্রতিদিন ধূমপান করা সিগারেটের গড় সংখ্যা ৯.১। এভাবে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রায় ১২৩ মিলিয়ন সিগারেট খাওয়া এবং সিগারেটের বাট তৈরি করা হয়।

তামাক উৎপাদন এবং বিতরণের ফলে প্রতিবছর প্রায় ২২ বিলিয়ন টন পানি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বান্দরবানের আলী কদম উপজেলা মাতামুহুরী নদীর পুরো এলাকা তামাক কোম্পানির দখলে

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মো. সাইফুল হাসান বাদলের নেতৃত্বে ৩১শে মে ২০২২ বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে– পিআইডি

৫ Factsheet from SEARO _ Bangladesh (WNTD 2022 Campaign Tobacco: Threat to our environment BANGLADESH)

৬ https://exposetobacco.org/bn/bbt?utm_source=fca&utm_medium=email&utm_campaign=bbt

৭ https://exposetobacco.org/bn/bbt?utm_source=fca&utm_medium=email&utm_campaign=bbt

থাকায় নদীটির প্রাণ ও পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। অথচ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি (বিএটি) নিরাপদ পানি সরবরাহের নামে এসডিজি-এর ৩ নম্বর গোল অর্জনে সহায়তা করছে বলে দাবি জানায়।[৮] পানি ও পরিবেশ বিধ্বংসী সকল কার্যক্রম আড়াল করে ২০২২ সালে 'Groundwater: Making the Invisible Visible'– স্লোগানকে সামনে নিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে বিএটিকে বিশ্ব পানি দিবস পালন করতে দেখা গেছে।[৯] বিগত সময়ে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে, কক্সবাজারের লামা এলাকায় তামাক চাষের কারণে মাটি নষ্ট হয়ে যাওয়া, পাহাড়ে মূল্যবান প্রজাতির গাছপালা তুন্দুলের লাকড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে।[১০] ব্যাপক পরিবেশগত ক্ষতির দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি দরিদ্রতা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। তামাকের স্বল্পমেয়াদি নগদ সুবিধাগুলো খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে এবং কৃষককে ঋণের জালে আবদ্ধ করে।

ধূমপান ঘরবাড়ি এবং আবাসিক ভবনে আগুন লাগার কারণ হিসেবেও চিহ্নিত। 'ধূমপান সম্পর্কিত আগুন' শব্দটি সেই আগুনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা সিগারেট, সিগার, পাইপ এবং ধূমপান সামগ্রী থেকে ঘটে। ২০০৮ থেকে ২০১০-এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাসিক ভবনগুলোতে আনুমানিক বার্ষিক গড়ে ৭,৬০০টি ধূমপান সম্পর্কিত আগুনের ঘটনা ঘটেছে। ঘাসের উপর সিগারেটের বাট নিক্ষেপ বনে আগুনের সূত্রপাত করে। ২০১০ সালে একটি সিগারেটের বাট ভারতের কেরালা রাজ্যে আগুনের সৃষ্টি করে এবং ৬০ হেক্টর বনাঞ্চল পুড়িয়ে দেয়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এরকম আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। তামাকের ধোঁয়া অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পরিবেশকে দূষিত করে এবং সিগারেট নিভে যাওয়ার অনেক পরেও বিষাক্ত পদার্থের বিস্তৃতি ঘটায় এবং উৎস থেকে যায়।

২০১৮ সালে বাংলাদেশে মোট ১৯ হাজার ৬৪২টি অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ৩ হাজার ১০৮টি ঘটনায় আগুনের সূত্রপাত হয়েছে সিগারেটের টুকরো থেকে। বাংলাদেশে দুর্ঘটনা ও অগ্নিকাণ্ড নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বলছে, বাংলাদেশে সংগঠিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ১৫ শতাংশের কারণ সিগারেটের টুকরো।[১১]

তামাক চিবানোর ফলে তৈরি হওয়া থুতু পরিবেশকে অত্যন্ত দূষিত, নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। চলমান COVID-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশে Environmental, Social and Governance (ESG) মানদণ্ড বিবেচনায় তামাক কোম্পানি নিজেদের ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেছে। এ বিষয়ে টেকসই বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে, সাধারণত ESG মানদণ্ডের জন্য কোম্পানির প্রকৃত, মুখ্য পণ্য বা পরিষেবাগুলোর স্থায়িত্বকে মোটেই বিবেচনা করা হয় না। কোম্পানিগুলো কী কাজ করে সে বিষয়ের পরিবর্তে তারা কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে সেদিকে নজর দেওয়া হয়। ESG সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্যে ব্যাবসাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ও প্রভাব বিবেচনা করা অপরিহার্য নয়। সে কারণে ESG অ্যাওয়ার্ডগুলোতে সাধারণত তামাকজাত পণ্যের প্রাণঘাতী দিকটি উপেক্ষা করা হয়। বিশ্বব্যাপী ৬০০টিরও বেশি ESG প্রক্রিয়া রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। যেহেতু ESG রিপোর্ট প্রকাশ করার কোনো নির্ধারিত মানদণ্ড নেই, সেহেতু তামাক কোম্পানিগুলো শুধু স্থায়িত্ব সংক্রান্ত এমন ডাটাগুলো তুলে ধরার স্বাধীনতা পায় যেগুলো তাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরে। যদি কোনো ESG স্বীকৃতি প্রদানকারী তাদের মূল্যায়নের সময় খারাপ ফলাফল দেয় তাহলে কোম্পানিগুলো সে স্বীকৃতি প্রাপ্তির স্কিম থেকে তাদের অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করে নিতে পারে। কোনো স্কিমে তাদেরকে ইতিবাচকভাবে দেখানো হলে কোম্পানিগুলো সেটি গ্রিনওয়াশিংয়ের একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করে।[১২] সবুজের আড়ালে জীবন বিধ্বংসী পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে দায়বদ্ধ করার সময় এসেছে। এমতাবস্থায় আমাদের সুপারিশ–

- তামাক কোম্পানি থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার
- তামাক চাষ নীতি চূড়ান্তকরণ
- এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে আচরণবিধি প্রণয়ন
- তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন এবং অন্যান্য বিষয়গুলো যুগোপযোগী করা[১৩]
- ক্ষতিকর পণ্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে পুরস্কার প্রদান থেকে বিরত থাকা।

৮ BAT, ESG Report, 2021
৯ PROBAHO's pure drinking water creating hopes for rural life (tbsnews.net)
১০ তামাকের শৃংখল থেকে মুক্তি, উবিনীগ
১১ https://www.jagonews24.com/national/news/482851
১২ https://exposetobacco.org/wp-content/uploads/Talking_Trash_BN_.pdf
১৩ Sustainable Development Goals

সৈয়দা অনন্যা রহমান : হেড অব প্রোগ্রাম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, anonna@wbbtrust.org

ভেরিফিকেশন সেবায় হটলাইন চালু

মুন্সিগঞ্জে পাসপোর্ট ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশনসহ সব ধরনের পুলিশ ভেরিফিকেশন সেবা দ্রুততর ও সহজীকরণের লক্ষ্যে হটলাইন নম্বরের চালু করেছে জেলা পুলিশ। ৭ই সেপ্টেম্বর পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ বিষয়ে এক হটলাইন নম্বর ০১৩২০০৯৪২৯৯ উদ্‌বোধন করা হয়।

পুলিশ সুপার জানান, ২০২০ সাল থেকে বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বিগত বছরগুলোতে বিদেশে যাওয়ার হার হ্রাস পায়। সম্প্রতি করোনার প্রকোপ কমে আসায় মুন্সিগঞ্জসহ দেশব্যাপী বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পাসপোর্ট ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রাপ্তির আবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে। গত জুলাই মাসে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য মোট আবেদন ছিল ২৯১২টি, আগস্ট মাসে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪৯৩টি। গত জুলাই মাসে পাসপোর্টের ভেরিফিকেশন হয় ৬৫০৯টি, আগস্ট মাসে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৪৪৬টি। কোনো হয়রানি ছাড়া সাধারণ মানুষ যেন নির্ধারিত সময়েই পাসপোর্ট ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স হাতে পায় তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য যেন সহজেই পেতে পারে সেজন্য জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে হটলাইন নম্বর চালু করা হয়। এ নম্বরে কল দিয়ে জনসাধারণ এ সংক্রান্ত যে-কোনো তথ্য ও অভিযোগ জানাতে পারবেন।

প্রতিবেদন: আনিকা তাবাস্‌সুম

বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে সাফল্য ও সম্ভাবনা

হুসাইন মামুন

সময় এখন তথ্যপ্রযুক্তির। বিশ্ব চলে এসেছে হাতের মুঠোয়। এখন ঘরে বসে যেমনি সারা বিশ্বের খোঁজখবর রাখা যায়, ঠিক তেমনি ঘরটাও হতে পারে নিজ কর্মস্থল। সেটা সম্ভব ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে। বর্তমানে তরুণ প্রজন্মসহ সব বয়সিরা ফ্রিল্যান্সিং করে, কেউবা আউটসোর্সিং করে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। দেশের অর্থনীতিতে অবদানের লক্ষ্যে এই সেক্টরকে আরও ত্বরান্বিত করতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ।

মূলত ফ্রিল্যান্সিং ও আউটসোর্সিং এক জিনিস নয়। এর মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রথম পক্ষের কোনো কাজ যখন দ্বিতীয় পক্ষ (কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) দ্বারা থার্ড পার্টির মাধ্যমে করিয়ে নেওয়া হয়, সাধারণত সেটাকেই আমরা আউটসোর্সিং বলে থাকি। আবার ফ্রিল্যান্সিং কোনো ধরনের চাকরি, অফিস ছাড়াই যে পদ্ধতিতে নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে আয় করা যায়, ঐ মাধ্যমকেই ফ্রিল্যান্সিং বলে। অর্থাৎ একজন আউটসোর্সার নিজে কাজ না করে একজন ফ্রিল্যান্সারকে দিয়েও কাজ করিয়ে নিজে অর্থ উপার্জন করতে পারে।

বাংলাদেশে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় লাখ। এর মধ্যে প্রতিনিয়ত কাজ করছে এমন ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। ফ্রিল্যান্সাররা যে সকল মার্কেট প্লেসে কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–

- আপওয়ার্ক (Upwork)
- ফাইভার (Fiverr)
- ৯৯ডিজাইনস (99designs)
- ফ্রিল্যান্সার ডটকম (Freelancer.com)
- পিপলস পার আওয়ার (Peoplesperhour)
- ডিজাইন হিল (Designhill)
- গুরু ডটকম (Guru.com)

কেউবা আবার ড্রিবল (Dribbble), বিহেন্সের (Behance) মতো সাইট থেকে ক্লায়েন্টকে অফলাইনে নিয়ে এসে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কাজ করছেন। এ সকল ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে–

- সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেকনোলজি (Software Development and Technolgy)
- ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া (Creative and Multimedia)
- সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং সাপোর্ট (Sales and Marketing Support)
- রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন (Writing and Translation)
- ক্লেরিকাল অ্যান্ড ডাটা এন্ট্রি (Clerical and Data Entry)
- প্রফেশনাল সার্ভিস (Professional Service)

উল্লিখিত ক্যাটাগরির মধ্যে জনপ্রিয় কিছু সেক্টর যেমন– গ্রাফিক ডিজাইন, ইউআই/ইউএক্স, এসইও, ওয়েব ডিজাইন, কনটেন্ট রাইটিং, ডিজিটাল মার্কেটিং, ট্রান্সলেশন, ভিডিও এডিটিং, ভিজুয়াল ডিজাইন, ডিজিটাল প্রিন্টিংসহ বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করছে বাংলাদেশের তরুণরা। বিশ্বে বছরে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার রয়েছে আউটসোর্সিংয়ে। আর বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমে বছরে রেমিটেন্স আসে প্রায় ৫০ কোটি ডলার। আগামীতে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ৫ শতাংশ অবদান রাখবে আউটসোর্সিং। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট ও ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তথ্যে এসব জানা যায়।

এই খাতে এক বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করেন তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তা-ব্যবসায়ীরা। যদিও সরকার প্রতিবছর পর্যাপ্ত পরিমাণে বিনিয়োগ করছে এ খাতের জন্য। বিভিন্ন স্থানে গড়ে তুলছে আইটি পার্ক। এখানে একদিকে তৈরি হচ্ছে দক্ষ ফ্রিল্যান্সার এবং অন্যদিকে তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ। ২০১৭ সালে ২৫৩০৯.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যশোরে তৈরি হয়েছে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', যেখানে ৫০০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও কালিয়াকৈরে 'বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক', সিলেটে ও রাজশাহীতে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক' গড়ে উঠেছে।

সম্প্রতি সরকার ফ্রিল্যান্সারদের ভার্চুয়াল আইডি কার্ড প্রদান করেছে। যার ফলে একদিকে তারা পাচ্ছেন সরকারি স্বীকৃতি এবং অন্যদিকে কোনো প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর জন্য পাবেন আর্থিক ঋণ। ২০১৮ সালে ফ্রিল্যান্সিং জগতে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয়। ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও কানাডার মতো দেশগুলোকে ছাড়িয়ে বিশ্বে এখন দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। (তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম)

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১০০ টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান খুব দাপটের সঙ্গে টিকে আছে এই ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে। নারী ও প্রতিবন্ধীরাও পিছিয়ে নেই এই সেক্টরে। এমনকি অনেক নারী ও প্রতিবন্ধীরা টপ লেভেলের ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কাজ করছে আপওয়ার্ক ও ফাইভারের মতো মার্কেট প্লেসে। নারীদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং এক সুবর্ণ সুযোগ আর বিশাল প্ল্যাটফর্ম যেখানে নারীরা কাজ করে একইসঙ্গে ক্লায়েন্ট এবং সংসার দুটোই সামলাতে পারেন, তা-ও খুব আরামে; কেননা এই সেক্টরে বাসায় বসেই কাজ করার সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গেছে, পুরুষ ফ্রিল্যান্সারদের তুলনায় নারী ফ্রিল্যান্সাররা অত্যধিক দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন। বাংলাদেশের নারীরাও পিছিয়ে নেই ফ্রিল্যান্সিংয়ে। এদেশের বিপুল সংখ্যক নারীদের ফ্রিল্যান্সিং আগমনের পথ সুনিশ্চিত করা সম্ভব হলে এই কর্মক্ষেত্রেও নারীরা নিজেদের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিকে আরও চাঙা করে তুলতে পারবে।

ফ্রিল্যান্সিং সেক্টর হতে পারে দেশের সবচেয়ে বড়ো রেমিটেন্স আয়ের খাত। সৃষ্টি হতে পারে লাখ লাখ নতুন কর্মসংস্থান, যা দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য ব্যক্তি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে সরকারি উদ্যোগে আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, এমনটাই মনে করছেন এই সেক্টরের ফ্রিল্যান্সার ও বিশিষ্টজনেরা।

হুসাইন মামুন : সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও ফ্রিল্যান্সার

স্তন ক্যানসার প্রতিরোধে চাই সচেতনতা

ফাইজা ইসলাম

১০ই অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস। স্তন ক্যানসার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে ২০১৩ সাল থেকে এই দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বিশ্বে প্রতি ৮ জনে ১ জন নারী স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশের নারীরা যেসব ক্যানসারে আক্রান্ত হয় তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে স্তন ক্যানসার। দেশের স্তন ক্যানসারের রোগীর মধ্যে ৯৮ শতাংশই নারী। প্রতিবছর এই ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছে প্রায় ২০ হাজার নারী। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশই নিরাময়যোগ্য।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশি বয়সে প্রথম সন্তান ধারণ করা বা নিঃসন্তান থাকা, সন্তানকে বুকের দুধ পান না করানো, বয়স ৩৫ বছরের ঊর্ধ্বে হলে, পরিবারের কারো স্তন ক্যানসার থাকলে, দীর্ঘদিন ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য বড়ি খেলে, অত্যধিক চর্বিযুক্ত খাবার খেলে, ধূমপান, মদ্যপান এবং তামাক জাতীয় দ্রব্যে আসক্ত থাকলে, দীর্ঘদিন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে থাকা নারীরা স্তন ক্যানসারে বেশি আক্রান্ত হয়।

স্তন ক্যানসার হলে সাধারণত নীচের উপসর্গগুলো দেখা দেয়:

- স্তনে ব্যথা অনুভব করা এবং একটি পিণ্ডের মতো অনুভব হয়
- স্তনের বোঁটা থেকে রক্ত বের হয়
- স্তনের আকার ও আকৃতির পরিবর্তন হয়
- স্তনের ত্বকে লালচে দাগ দেখা দেওয়া
- স্তনের ত্বকে ঘা দেখা দেওয়া।

শরীরের কোথাও অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি হলে সেটাকে সাধারণত টিউমার বলে। স্তনে দুই ধরনের টিউমার হয় যেমন বিনাইন টিউমার ও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বিনাইন টিউমার উৎপত্তি স্থলে সীমাবদ্ধ থাকলেও ম্যালিগন্যান্ট টিউমার আগ্রাসী ধরনের– যা রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে দূরের বা কাছের গ্রন্থিকে আক্রান্ত করে। স্তনের ম্যালিগন্যান্ট টিউমারই হচ্ছে ক্যানসার যা দুধবাহী নালিতে হয়। কখনও কখনও অন্যান্য টিস্যু থেকেও শুরু হতে পারে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রথমে একটি পিণ্ড বা চাকা হিসেবে দেখা দেয় এবং আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। স্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে বাহুমূলেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।

৫০ বছরের বেশি বয়সি নারীদের মধ্যে এই ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। এতদিন এই ক্যানসারের ব্যাপারে নারীদের সচেতন করার জোরটা ছিল বেশি, এখন পুরুষদেরও সচেতন করার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে স্তন ক্যানসার হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পুরুষদের স্তন ক্যানসার আক্রান্তের হার অনেক কম।

৫০ থেকে ৭০ বছর বয়সি নারীদের প্রতি তিন বছর পরপর ব্রেস্ট স্ক্রিনিং বা ম্যামোগ্রাম করানো জরুরি। ম্যামোগ্রাম হচ্ছে এক্সরের মাধ্যমে নারীদের স্তনের অবস্থা পরীক্ষা করা। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার এত ছোটো থাকে যে বাইরে থেকে তা বোঝা সম্ভব হয় না, ম্যামোগ্রামের মাধ্যমে খুব ছোটো অবস্থায়ই ক্যানসার নির্ণয় করা সম্ভব। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যানসার ধরা পড়লে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ক্যানসার শনাক্তের পর এর সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। স্তন ক্যানসারে যে চিকিৎসাগুলো রয়েছে সেগুলো হলো– সার্জারি, কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি ও হরমোন থেরাপি ইত্যাদি। কোন রোগীর জন্য কোন চিকিৎসা প্রয়োজন তা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সিদ্ধান্ত দিবেন।

স্তন ক্যানসারের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। তাই এই ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং নিয়মিত স্তন পরীক্ষা খুবই প্রয়োজন। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ৩০ বছর পর প্রতিমাসে ঋতুস্রাবের পর নিজেই নিজের স্তন পরীক্ষা করা জরুরি।

আমাদের দেশে এখন ক্যানসারের পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব। বাংলাদেশ ক্যানসার ইনস্টিটিউটসহ সরকারি-বেসরকারি সব জায়গাতেই স্তন ক্যানসারের চিকিৎসা রয়েছে। সরকারিভাবে স্তন ক্যানসার নিরাময়ের খরচ অনেক কম। অনেকে আবার বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। তাই স্তন ক্যানসারকে ভয় না পেয়ে সচেতন হয়ে জীবন রক্ষা করা সম্ভব।

ফাইজা ইসলাম: প্রাবন্ধিক

প্রবাসবন্ধু হটলাইন চালু

প্রবাসবন্ধু হটলাইন '১৬১৩৫' চালু করা হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও ঋণ সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন তথ্য, প্রবাসীকর্মী ও তাদের পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড ৫ই সেপ্টেম্বর এটি চালু করেছে । '১৬১৩৫' টোল ফ্রি নম্বরে 'প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার' নামে হটলাইনে সংশ্লিষ্ট সকলে বিনা খরচে কল করে যে-কোনো সময় (২৪/৭) কল সেন্টার থেকে তথ্য সেবা পেতে পারেন। এছাড়া বিদেশ থেকে +৮৮০৯৬১০১০২০৩০ নম্বরে এই সেবা পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদন: সামিরা আলম

আর্থসামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ নারী

সাবিহা শিমুল

পরিবার ও সমাজে গ্রামীণ নারীর অবস্থান ও কর্মের মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে ২০০৭ সালের ১৮ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভায় প্রতিবছর ১৫ই অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস' পালনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ফলে ২০০৮ সাল থেকে প্রতিবছর জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো এ দিবস পালন করে আসছে। তবে এর আগে ১৯৯৫ সালে গ্রামীণ নারীর খাদ্য উৎপাদনসহ সমাজের নানামুখী ভূমিকা পালনের স্বীকৃতির জন্য বেইজিং সম্মেলনে প্রতিবছর ১৫ই অক্টোবরকে 'আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশ এই দিবসটি পালন করে থাকে।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য। তাদের যথাযথ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়ার জন্য আন্দোলন চলছে যুগের পর যুগ। তবে বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপের কারণে নারীরা ধীরে ধীরে উন্নতি আর অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজের অগ্রগতিতে এখন পুরুষের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীরা অবদান রেখে চলেছেন। সারা দেশে বিশেষ করে গ্রামীণ নারীর অগ্রগতি দেখার মতো।

নারীদের কর্মের অভাব নেই। ঘরগৃহস্থির কর্ম করেই নারী তার ব্যস্ত সময় কাটান। কেউ ছাগল পালন করেন, কেউ হাঁস-মুরগি, কেউ গাভী, বাড়ির আশপাশে খালি জায়গায় লাউ, কুমড়া, শসা, সিম, লালশাক ইত্যাদি উৎপাদন কাজে খুব ব্যস্ত সময় পার করেন বেশির ভাগ গ্রামীণ নারী। পরিবারের সচ্ছলতার জন্য তাদের আন্তরিক পরিশ্রমের ফল যেন গোটা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

গ্রামাঞ্চলের নারীদের নিপুণ হাতে সুঁই-সুতায় তৈরি পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসার ঘটছে। গ্রামের ঘরে ঘরে সুঁই-সুতায় হস্তশিল্পের তৈরি পণ্যে তারা দিন দিন স্বাবলম্বী হচ্ছে। সারা দেশের অলিগলির প্রতিটি ঘরেই হস্তশিল্প পণ্য তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এসব কারখানায় সুঁই-সুতায় কারুকাজে বাহারি ডিজাইনের হস্তশিল্পের পণ্য তৈরি করছেন নারীরা। এর মধ্যে আছে– থ্রি-পিস, পাঞ্জাবি, বিছানার চাদর, বালিশের কভার(কুশন), শাড়ি, বিভিন্ন আইটেমের ব্যাগ ও হাতপাখা। এর মধ্যে নকশিকাঁথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের সীমা ছাড়িয়ে এসব হস্তশিল্পের পণ্য এখন বিদেশে যাচ্ছে। এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। হস্তজাত পণ্য তৈরি করে জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু নারী 'শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তা'র স্বীকৃতিও পেয়েছেন।

গ্রামীণ নারীদের হস্তশিল্পের পণ্য ঢাকাসহ প্রতিটি জেলার সড়কের দুই পাশে তাদের পরিচালিত পণ্য তৈরির কারখানা ও দোকান চোখে পড়ে। বাসাবাড়িতেও তৈরি হয়েছে শোরুম। এসব শোরুমে নারী বিক্রেতাদের হস্তশিল্প পণ্য বিক্রি করতে দেখা যায়। সারা দেশে বেকারত্ব ঘোচাতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে এই শিল্প। বহু নারী হস্তশিল্পের কাজ করে সংসার চালান ও ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ জোগান। গ্রামীণ নারীদের হস্তশিল্পের পণ্য ঢাকাসহ সারা দেশের খ্যাতি অর্জন করে বিদেশেও পরিচিতি লাভ করেছে। সৃষ্টি হয়েছে অনেক নারীর কর্মসংস্থান। সংসারে কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রামীণ নারীরা ব্লক-বাটিক শেখার প্রশিক্ষণ দেন। যা দ্বারা তারা অনেক টাকা উপার্জন করেন।

গ্রামীণ নারীরা মৃৎশিল্প যেমন: মাটির হাঁড়ি-পাতিল, পুতুল, ফুলদানি, থালা-বাসন ইত্যাদি তৈরি করেন এবং এসব দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে আজ তারা সফল উদ্যোক্তা হয়েছেন। যার ৮০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলের নারী। বাড়তি আয়ের জন্য অনেক মধ্যবিত্ত

পরিবারের গৃহিণীরাও এই কাজে যুক্ত হয়েছেন। প্রতি মাসে তারা ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আয় করছেন। এসব সম্ভব হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও এদেশের জাতিকে 'বাংলাদেশের সংবিধান' উপহার দেন। বঙ্গবন্ধু দেশের অর্ধেক নাগরিক নারীর উন্নয়ন এবং নারীর অগ্রযাত্রাকে সংবিধানে স্থায়ী রূপ দিতে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা অন্তর্ভুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেছিলেন অর্ধেক নারীকে কর্মে বাদ না দিয়ে যদি কর্মে নিয়োজিত করা যায়, তাহলে দেশটা সোনার বাংলায় রূপ নিতে বেশি সময় লাগবে না। তিনি শুরু করেছিলেন নারী-পুরুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণে দেশ পরিচালনার কাজ। সেই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলস কাজ করে চলেছেন। যেখানে কেউ কল্পনা করতে পারেনি,

সেখানেই নারীকে নিয়োজিত করেছেন। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উন্নয়নের কাজ তরান্বিত করছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আর্দশ অনুসরণ করে নারীকে সর্বত্র সহযোগিতা, প্রেরণা, উৎসাহ দিয়ে সমঅধিকারের ভিত্তিতে এমন একটি সমাজ গড়তে চান, যে সমাজে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। যে সমাজে থাকবে না ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব। মানুষের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হবে। এজন্য তিনি গ্রামকেই দিয়েছেন– 'আমার গ্রাম আমার শহর' পল্লি উন্নয়নের রূপরেখা প্রকল্প। আর এজন্য শহরের সব সুবিধা ও উন্নয়ন ধারা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার নানা প্রকল্প, নানা কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের কাজটি শুরু হয়েছে তৃণমূল নারীদের থেকেই। তারা প্রমাণ করতে পেরেছেন নারীরা আজ অর্থনীতির মূলস্তম্ভ। পল্লির নারীরা বেশি উৎপাদনশীল, বেশি পরিশ্রমী। তাদের যথাযথ কর্মের জোগান দিতে পারলে তৃণমূল জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। প্রত্যন্ত অঞ্চলে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা পৌঁছে দিতে 'আমার গ্রাম আমার শহর'-এর ধারণা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশের সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পল্লি উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। পল্লিতে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশের ৪০ শতাংশই নারী। ৮০ শতাংশ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দেওয়া পুরুষের একার পক্ষে অসম্ভব। দরিদ্র মানুষের জীবিকার উন্নয়ন হবে টেকসই। তাই সম্মিলিত প্রয়াস অবশ্যই প্রয়োজন।

নারীরা যেন পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য বাংলাদেশ সরকার অনেকগুলো নারীবান্ধব আইন প্রণয়ন করেছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। নারীর মর্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছু আইন নারীকে সম্মানিত করেছে। নারী উন্নয়ন নীতি ২০২১-তে নারীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ক্ষমতায়নে বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অগ্রাধিকার 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পের ৬০ শতাংশই নারী। সরকার গ্রামীণ নারীদের খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। নারী উদ্যোক্তাদের বিনা জামানতে স্বল্পসুদে ঋণ দিচ্ছে। এসব কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিবছর প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নারী অর্জন করছে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার'।

বর্তমানে অনেক চ্যালেঞ্জিং পেশা নারীরা গ্রহণ করছেন। সমাজে নারীদের ক্ষমতায়ন ঘটেছে, অবদান বেড়েছে। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে উন্নয়নে আরও সম্পৃক্ত করতে পারলে দেশের অগ্রগতি আরও টেকসই হবে। শ্রমশক্তি বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার সম্পদ, যা দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণে এগিয়ে যাওয়ার পথে অবদান রাখছে। ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, এমন লক্ষ্যে প্রত্যয় এবং অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে সরকার, যেখানে আমাদের সবার সহযোগিতা প্রয়োজন। নারীদের অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে আবশ্যক। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পুরুষের চেয়ে নারীদের অবদান বেশি। নারীর অবদান ৫৩ শতাংশ আর পুরুষের ৪৭ শতাংশ। নারীরা কৃষিকাজে জড়িত কাজের ২১টি ধাপের মধ্যে ১৭টি ধাপেই কাজ করে থাকেন। ফসলের প্রাক বপন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বিপণনের সঙ্গে ৬৮ শতাংশ নারীই সম্পৃক্ত। গত এক দশকে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ বাড়তি শ্রমশক্তির মধ্যে ৫০ লাখই নারীরা কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ নানা কাজ করছে। গার্মেন্টস কর্মীর প্রায় ৫৪ শতাংশই নারী।

আমাদের অর্থনীতি এবং ২০৪১ সালের উন্নত সমৃদ্ধশালী দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর একনিষ্ঠ পরিশ্রমে দেশের অর্থনীতির চিত্র পুরো বদলে যাচ্ছে। তাই ঘরে-বাইরে গ্রামীণ নারীর নিরাপত্তা, কাজের স্বীকৃতি, যথাযথ মজুরি পাক– সেটাই হোক আজ আমাদের মূল অঙ্গীকার।

সাবিহা শিমুল: প্রাবন্ধিক

তুমিই বাংলাদেশ

রাজিয়া রহমান

তুমিই সেই বাংলাদেশ
যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল বাংলাদেশের।
তুমিই বাংলাদেশ
যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল স্বাধীন ভূখণ্ডের।
তুমিই বাংলাদেশ
যাঁর একক নেতৃত্বে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল।
তুমিই সেই বাংলাদেশ
যাঁর সাতই মার্চের দৃপ্ত ডাকে
স্বাধীনতা পেতে উজ্জীবিত হয়েছে বাংলাদেশ
তুমিই সেই মহানায়ক
যাঁকে জাতি ভরসা করে
যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে
তুমিই সেই মহানায়ক
যাঁর বজ্রকণ্ঠে উচ্চারিত হয়
'জয় বাংলা' যুদ্ধ জয়ের স্লোগান।
তুমিই সেই মহানায়ক
যে শাসকের নয়,
শোষিতের পক্ষে কথা বলে।
তুমিই সেই বাংলাদেশ
শোষণের বিরুদ্ধে যাঁর
বজ্রকণ্ঠ উচ্চারিত হয়
তুমিই সেই মহানায়ক
মৃত্যু হাতের মুঠোয় নিয়েও
সর্বদা লড়াই যাঁর অন্যায়ের বিরুদ্ধে।
তুমিই সেই নায়ক
ছেষট্টিতে ছয় দফার মাধ্যমে
যিনি দিয়েছিলেন মুক্তিসনদ।
তুমিই সেই মহানায়ক যাঁর তর্জনীর ভয়ে
কেঁপে উঠত শত্রু শিবির
তুমিই সে বাংলাদেশ
স্বাধীনতা এনে দিতে
বার বার কারাবরণ যাঁর
তুমি সে বাংলাদেশ
যেখানে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান
সমান অধিকারে বাস করে।
তুমিই সে বাংলাদেশ
যিনি সহজ-সরলভাবে ঘাতকদের বিশ্বাস করেছিলেন
তুমিই সে বাংলাদেশ
যিনি দেশের তরে সপরিবার জীবন করেন দান।
সেই তুমিই বাংলাদেশ
অন্ধকারে আলোর সূর্য
তুমিই মুক্তির দিশা।

বঙ্গবন্ধু

নাজমুল হুসাইন বিদ্যুৎ

গ্রাম থেকে গ্রাম– মাঠ থেকে মাঠ
গেলে তোমার চিহ্ন ফেলে
আন্দোলিত হয় চিরহরিৎ
তোমাকে যায়নি কভু ভুলে,
কী করে যায় ভোলা পিতার মুখ
জন্মান্তরে শুধি ঋণ
স্বাধীনতার মহানায়ক তুমি
এ হৃদয়ে চির অমলিন।

জয়গান তব আজি মনে বাজে
সব মিথ্যা ছিন্ন করে
চিরদিনের প্রেম ভুলিবার না
মিশেছো যে জীবনের তরে।

তুমি বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
কাঁপিয়ে দিয়েছিলে বিশ্ব
কণ্ঠে ছিল স্বাধীনতার ডাক
দারুণ সেই মহাকালের দৃশ্য।

তর্জনী তোমার আকাশ ছোঁয়া
লাখো বীর জনতার মাঝে
দাবায়ে রাখা যায় না যে কণ্ঠ
মধুর সে সুর কানে বাজে,
মধুর সে সুরে মুক্তির পথে
জীবনের বাজি রেখে চলি
বিশ্বনেতা বঙ্গবন্ধু তুমি
জাতির পিতা মুজিব বলি।

লক্ষ কোটি রাসেল

লিলি হক

জ্যোৎস্না ভরা রাতে, আলোর মশাল হাতে
নামলে তুমি হাসু আপার কোলে
পূর্ণিমা চাঁদ যেন দোদুল দোলে,
কাজল চোখে মিষ্টি হেসে, মায়ের বুকে
ওমের পরশ সাত রাজার ধন
মানিক রতন মুখ লুকালে এসে।
অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহসী আবাস
গড়ে তুলেছিলে ঐ শিশুকালে ভালোবেসে
স্কুলের বন্ধুদের সাথে মিলেমিশে।

বঙ্গবন্ধুর পরম আদরের লক্ষ্মীসোনা শেখ রাসেল
প্রিয় দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের নামে নামটি
ছিল তার, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক
চেতনার প্রভাবে মানবিক গুণাবলি নিয়ে
তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান হবে রাসেলের মতো উদার।

টিফিন ভাগ করে খেয়ে, পড়ার সময় পড়া,
খেলার সময় খেলা, আর্মি অফিসার হওয়ার
স্বপ্ন বক্ষে ধারণ করে সাথিদের নিয়ে ট্রেনিং
মহড়া শেষে পুরস্কৃত করা।
আহারে বঙ্গবন্ধু আর বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা
মুজিব-এর কলিজার টুকরো শেখ রাসেলকে
নির্মমভাবে ১৫ই আগস্ট পরিবারের সবার
সাথে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মুছে দেয়া হলো।
রচিত হলো সবচেয়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড !
ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে পঁচাত্তরের সেই ভয়াল
রাতে ষড়যন্ত্রের দমকা হাওয়ায় নিভে গেল
বঙ্গবন্ধু পরিবারের দেদীপ্যমান আলোকোজ্জ্বল
দীপশিখাগুলোর সাথে সর্বশেষ প্রদীপটি,
নাম শেখ রাসেল। মানব ইতিহাসের সকল
ট্র্যাজেডিকে ম্লান করে দিতে পারে রাসেলের
শোকার্ত নিষ্ঠুর নির্মম গাথার জন্যে, রাসেল
অমর, রাসেল জীবন্ত। তার অপূর্ব জীবনাচরণের
স্বপ্ন বাস্তবায়নে, লক্ষ-কোটি রাসেল বাংলাদেশকে
এগিয়ে নিয়ে যাবে আগামীর আমন্ত্রণে।

শহিদ শিশু শেখ রাসেল

বেগম শামসুন নাহার

আমায় তুমি চিনেছো কবি
সেদিন তখনও বাংলার আকাশে উদিত
হয়নিকো রবি,
হয়নিকো পিতার কোলে বসে
আহার গ্রহণ–
মাতার বকুনি খাওয়া
হয়নিকো পরশ নেওয়া
পরম স্নেহের ...
আমার হাসু আপুর।
হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো,
রক্তের হলি খেলায় মেতেছিল দুর্বৃত্তরা
বুলেটের আঘাতে আঘাতে শহিদ হলেন–
জনক-জননী-ভ্রাতা-ভগিনিরা
নিথর পড়ে রইলেন তাঁরা
বুলেটের আঘাতে বুকের রক্ত
ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল সব
রঞ্জিত হলাম আমিও–
ভিজে গেল ইতিহাসের পাতা।
সেই থেকে বাংলার এক কালো অধ্যায়ের
গর্বিত শহিদ আমি;
আমি কালের সাক্ষী
সেই শিশুটি শহিদ শেখ রাসেল।
আর একবার ইতিহাসের পাতায়–
লিখে দিও তুমি ...
লিখে দিও আমার নাম।

শেখ রাসেল

আবুল হোসেন আজাদ

ফুলের মতো যে শিশুটি
সবার চোখের মণি
বাবা মায়ের ভাইয়া ভাবির
বুকের সোনার খনি।

যে শিশুটি হাসু আপুর
ছিল স্নেহধন্য
তার যে আদর ভালোবাসায়
সোহাগে অনন্য।

সেই শিশুটি হারিয়ে গেল
পরিবারের সাথে
পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট
কলঙ্কিত রাতে।

শেখ রাসেল নাম সেই শিশুটির
জাতির পিতার তনয়
ভুলতে পারা যায় না তারে
কখনও ভোলার নয়।

ফিরে এলে অক্টোবরে
জন্মদিনটি তার
ব্যথার ঢেউয়ে মনটাজুড়ে
ওঠে হাহাকার।

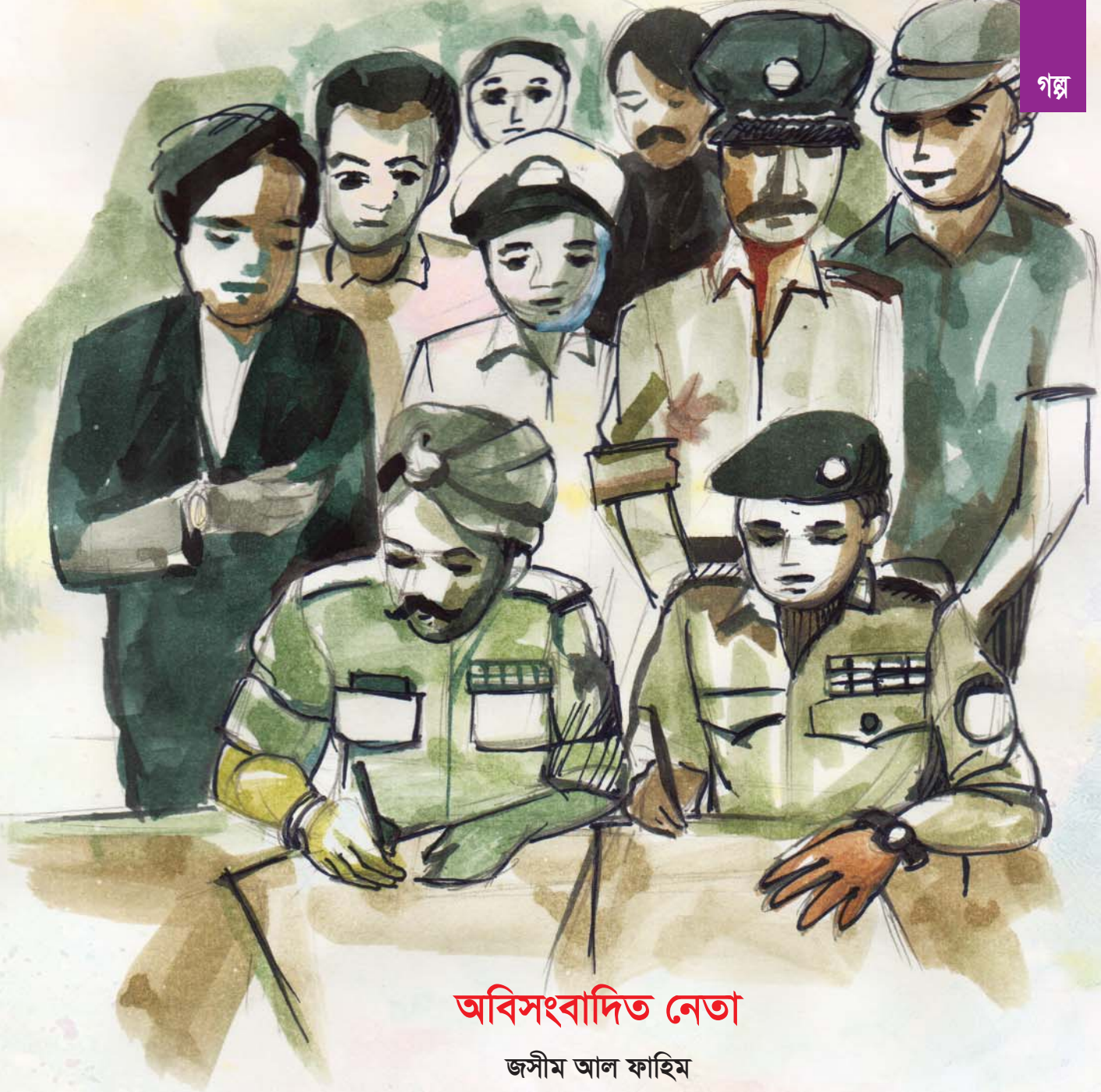

অবিসংবাদিত নেতা

জসীম আল ফাহিম

আবদুল হামিদ একজন সাদামাটা মনের মানুষ। কথা বলেন খুব কম। আপনমনে শুধু বিড়বিড় করেন। আপনমনে পথ চলেন। আর এদিক-ওদিক তাকান। তাকিয়ে কী যেন দেখেন! কী যেন ভাবেন! আবারও পথ হাঁটেন। এভাবেই চলে তার সারাটা দিন।

ইচ্ছে করে তিনি কারও সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বলেন না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তবেই জবাব দিবেন। কথা বলা শুরু করার পূর্বে তিনি অস্ফুট সুরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। তার এরূপ দীর্ঘশ্বাসের যে কী কারণ, তা কেউ জানে না। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে তবেই তিনি কথা বলা শুরু করবেন।

সেদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পর সদর দরজার পাশে একটা স্টোন বেঞ্চে তাকে বসে থাকতে দেখে আমি কিছুটা চমকিত হলাম। সম্পর্কে তিনি আমার ফুপাতো ভাই। ফুপা-ফুপু মারা গেছেন। হামিদ ভাইয়ের বড়ো একজন বোন আছে। তিনি আমাদের শ্যামলি আপা। পাশের গাঁয়ে তার বিবাহ হয়েছে। হামিদ ভাই আমাদের সঙ্গেই থাকেন।

হামিদ ভাই মাঝেমধ্যে বোনটির বাড়ি বেড়াতে যান। তবে কারও সঙ্গে খুব একটা কথাবার্তা বলেন না। শুধু শ্যামলি আপার সঙ্গে কিছু একটা বলাবলি করেন। বলে বলে দুভাইবোন চোখের জল ফেলেন। বিষয়টা বড়োই রহস্যজনক! আমি একদিন শ্যামলি আপাদের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। সেদিন আমি নিজের চোখে তাদের কান্নাকাটির দৃশ্যটা দেখেছি।

সদর দরজার পাশে তাকে একাকী পেয়ে মনে মনে ভাবলাম–হামিদ ভাইয়ের সঙ্গে আজ একটু নিভৃতে কথাবার্তা বলব। আমাকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। একটা ছাই রঙের চাদরে তার গলা পর্যন্ত ঢাকা। বললেন, 'স্কুল থেকে ফিরলি নাকি রহমত?'

আমি বললাম, 'জি ভাই। আপনি একাকী বসে আছেন যে! মনটন খারাপ নাকি?'

হামিদ ভাই বললেন, 'না-রে মন ভালোই আছে? যা ভেতরে যা। স্কুল ব্যাগ রেখে নাশতা কর গিয়ে।'

আমি বললাম, 'হামিদ ভাই, টিফিন আওয়ারে আমি নাশতা করে ফেলেছি। এখন কিছু খেতে মন চাচ্ছে না।'

হামিদ ভাই বললেন, 'তাহলে আয় আমার পাশে এসে বস।'

আমি চট করে গিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। বললাম, 'হামিদ ভাই, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

হামিদ ভাই কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'কী কথা রে!'

আমি বললাম, 'আপনি সবসময় এমন গম্ভীর হয়ে থাকেন কেন? আপনার মনের ভেতর কি অনেক দুঃখ?'

আমার কথা শুনে হামিদ ভাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, 'তুই ঠিকই ধরেছিস। আমার মনের ভেতর আগুন। আগুনটা সবসময় দাউদাউ করে জ্বলছে।'

আমি বললাম, 'হামিদ ভাই, আমাকে কী বিষয়টা খুলে বলা যায়? এতে যদি আপনার মনের আগুন কিছুটা নিভে।'

হামিদ ভাই বললেন, 'শুনবি তুই! সত্যিই শুনতে চাস নাকি?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

হামিদ ভাই আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'সে দীর্ঘ গল্প রে রহমত। শোনার ধৈর্য কি তোর হবে?'

আমি প্রত্যয়ী কণ্ঠে বললাম, 'নিশ্চয়ই হবে হামিদ ভাই। আপনি বলুন। আমি শুনছি।'

হামিদ ভাই শুরু করলেন, 'আচ্ছা রহমত, বাংলাদেশ শব্দটা কীভাবে এল জানিস?'

তার এরূপ প্রশ্ন শুনে আমি তো 'থ'। কোথায় তিনি আমাকে কিছু বলবেন, এখন দেখছি আমাকে পালটা প্রশ্ন করছেন। আমি বললাম, 'জি না ভাই।'

হামিদ ভাই বলতে লাগলেন, '১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ এক জরুরি আলোচনাসভার আয়োজন করল। সভায় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব বললেন, "একসময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে।...একমাত্র বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কোনো কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।...জনগণের পক্ষ হইতে আমি ঘোষণা করিতেছি–আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর পরিবর্তে হবে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।"

এটুকু বলে তিনি একটু থামলেন। আমি বললাম, 'তারপর কী হলো হামিদ ভাই?'

হামিদ ভাই বলতে লাগলেন, 'সেই থেকে এদেশের নাম হয়ে গেল বাংলাদেশ।'

আমি বললাম, 'বাহ্ চমৎকার তো! একটা ঐতিহাসিক বিষয় জানা হলো হামিদ ভাই।'

হামিদ ভাই বলতে লাগলেন, 'ঐতিহাসিক বিষয় আরও আছে। যত শুনবি ততই তুই আবাক হবি। আশ্চর্য হবি। ১৯৭১ সালের পূর্বে আমাদের এই বাংলাদেশকে শাসন করত পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তারা ইচ্ছেমতো আমাদের শাসন-শোষণ করত। আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। বাংলাদেশে উৎপাদিত কাঁচামাল জাহাজে করে ওরা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। এসব কাঁচামাল দিয়ে ওরা ওখানকার শিল্পকারখানাগুলো সচল রাখত। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের জীবনমান উন্নত করত। আর আমরা বাংলাদেশিরা শুধু ভূতের বেগার খেটে মরতাম।

বহুকাল আগে থেকেই বাংলাদেশে ধানের ফলন হতো বেশি। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বল প্রয়োগ করে বাংলাদেশের কৃষকদের পাট চাষের দিকে ধাবিত করত। চা চাষের দিকে ধাবিত করত। আর সেই সকল পাট ও চা নামমাত্র মূল্যে তারা কিনে নিত। পরে জাহাজ বোঝাই করে পশ্চিম পাকিস্তানে চালান করত। ফলে বাংলাদেশের মানুষের অভাব কখনো ঘুচত না। কৌশলে ওরা বাঙালি জাতিকে দারিদ্র্যসীমার মধ্যে আটকে রাখত।

বস্ত্র কারখানাগুলো ছিল সব পশ্চিম পাকিস্তানে। বাংলাদেশ শুধু কাঁচামালের জোগান দাতা। আমাদের কাঁচামাল ব্যবহার করে ওরা বস্ত্র তৈরি করত। আর সেই বস্ত্র আবার আমাদের কাছে এনেই চড়া দামে বিক্রি করত। বৈষম্য আর কাকে বলে?

শুধু কি তাই? অফিস-আদালতে গিয়ে খোঁজ নিলে দেখা যেত বড়োকর্তা একজন পশ্চিম পাকিস্তানি লোক। তারা বাঙালিদের মানুষ বলেই গণ্য করত না। সামরিক বাহিনী, আনসার, পুলিশ যা-ই বলিস না কেন সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্য দেওয়া হতো। অফিসার পদে কাজ করত ওরা। আর বাঙালিদের দেওয়া হতো করণিক আর পিয়নের চাকরি। হাসপাতালে গেলে বাঙালিদের নিম্নমানের সেবা প্রদান করা হতো। আর পশ্চিম পাকিস্তানিদের দেওয়া হতো উন্নত চিকিৎসা সেবা।

মানুষের বাড়িঘর ছিল সব ছন ও টিনের তৈরি। সারা এলাকায় পাকা দালান দু-একটাও খুঁজে পাওয়া যেত না। অধিকাংশ মানুষই ছিল দারিদ্র্যতার কষাঘাতে পিষ্ট। পাকা দালান তৈরির সাধ্য কোথায়?

বাঙালিদের জানমালের নিরাপত্তা বলতে কিছু ছিল না। বললাম না ওরা আমাদের মানুষই মনে করত না। জানমালের নিরাপত্তার তো প্রশ্নই আসে না। ইচ্ছে হলেই ওরা বাঙালিদের ওপর দমনপীড়ন চালাত।

তুই এখন কী সুন্দর স্কুল থেকে ফিরলি! অথচ তখন স্কুল-কলেজ ছিল অপ্রতুল। সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের দিকেই বেশি ঝুঁকে থাকত। বাঙালিদের খোঁজখবর নেওয়ার সময় কোথায় তাদের? ফলে প্রতিবছরই বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার বাড়ত। পশ্চিমারা কৌশল এঁটে ছিল বাঙালিদের যদি শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে রাখা যায়, তাহলে এদের যুগ যুগ ধরে শাসন ও শোষণ করা সহজ হবে। ফলে জাতি হিসেবে আমরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়তে লাগলাম।

এত অন্যায়, এত অবিচারের প্রতিবাদ কে করবে? কার বুকের পাটা এত বড়ো যে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর চোখে চোখ রেখে কথা বলে? কার এত দুঃসাহস যে পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে কথা কয়? একজন কিন্তু ঠিকই রুখে দাঁড়ালেন। তিনি হলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্থির করলেন, যে-কোনো উপায়ে হোক পিছিয়ে পড়া বাঙালি জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে ওদের হারাতে হবে। তবেই বাঙালি জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব। মহান নেতার আহ্বানে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হলো। যিনি সাধারণ জনগণের কথা ভাবেন তিনি তো সাধারণের বন্ধু, নাকি?

শেখ মুজিবুর রহমান অবহেলিত বাঙালিদের কথা ভাবেন বলে তিনিও বাঙালি জাতির একজন পরম বন্ধু।

১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিরাট এক গণসংবর্ধনা প্রদান করা হলো। সেই গণসমাবেশে প্রায় দশ লাখ ছাত্রজনতা উপস্থিত হলেন। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমিও সেখানে হাজির হলাম। সেই সমাবেশে আমরা তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলাম।

এটুকু বলে হামিদ ভাই আবারও থামলেন। আমি পুলকিত মনে বললাম, 'বাহ্। আরও একটা ঐতিহাসিক বিষয় জানা হয়ে গেল।'

হামিদ ভাই বললেন, 'এ আর এমন কী। গুণীজনের গুণের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে মাত্র। তারপর কী হলো শোন। বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিলেন–তাঁর দলবল নিয়ে তিনি পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করবেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধু প্রতীক নির্ধারণ করলেন নৌকা। সেই থেকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক হলো নৌকা।

৭ই ডিসেম্বর নির্বাচনের দিন ধার্য করা হলো। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীগণ সারা দেশে জনসংযোগে উঠেপড়ে লাগলেন। এতদিন পর সুযোগ পেয়ে এদেশের সাধারণ জনগণ ভোটের মাধ্যমে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কঠিন জবাব দিলেন। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল আওয়ামী লীগ ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি লাভ করেছে। আর প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে লাভ করল ১৮৮টি আসন। এটা ঐতিহাসিক বিজয় নয় কি?'

বলে হামিদ ভাই জবাবের প্রত্যাশায় আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই। নিঃসন্দেহে এটা একটা ঐতিহাসিক বিজয়।'

আমার জবাব শুনে মনে হলো হামিদ ভাই খুশি হয়েছেন। মিটিমিটি হাসলেন তিনি। বললেন, 'একদম সঠিক কথা। তারপর কী হলো শোন। কেন সবসময় আমার মন খারাপ থাকে। আর কেনই বা আমার মনের ভেতর আগুন জ্বলছে সব বলছি, শোন। আওয়ামী লীগের এই নিরঙ্কুশ বিজয় পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কী এত সহজে মেনে নিতে পারে? পারে না। তারা নানা টালবাহানা শুরু করে দিলো। বাঙালির হাতে রাষ্ট্রের শাসনভার তুলে দেওয়া মানে পশ্চিমা শাসকদের মাথা কাটা যাওয়া। তাই ওরা নানান অজুহাত দেখিয়ে মিটিংয়ের পর মিটিং করতে লাগল। কিন্তু ফয়সালা আর হলো না।

এদিকে বঙ্গবন্ধু ওদের সাফ জানিয়ে দিলেন, 'ক্ষমতা একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। ক্ষমতার মালিক এখন পূর্ব বাংলার জনগণ।'

বঙ্গবন্ধুর কথা শুনে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ পাকিস্তানের স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। তার এরূপ হটকারী সিদ্ধান্তের জন্য সারা বাংলায় শুরু হয় প্রতিবাদ। আওয়ামী লীগ নেতারা জরুরি বৈঠকে বসলেন। বৈঠকে সভাপতি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বৈঠক শেষে বঙ্গবন্ধু জানিয়ে দিলেন, '৩রা মার্চ দেশব্যাপী হরতাল পালন করতে হবে।'

সেদিন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ছাড়াও সর্বস্তরের সাধারণ জনগণ হরতাল পালনের উদ্দেশ্যে রাজপথে নেমে এলেন। সফলভাবে হরতাল পালিত হলো। হরতাল শেষে প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে বঙ্গবন্ধু কঠোর ভাষায় বললেন, 'অবিলম্বে জনতার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। নইলে মুক্তিকামী জনগণ কিছুতেই রাজপথ থেকে সরে দাঁড়াবে না।'

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এক জনসমাবেশের আয়োজন করা হলো। বিশাল এই জনসমুদ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।'

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিকে শৃঙ্খল মুক্তির আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে।'

পরে তিনি বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করতে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।'

সেই সঙ্গে তিনি ইয়াহিয়া খানের সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। বঙ্গবন্ধুর এরূপ ভাষণ শুনে পাকিস্তান সরকারের যেন ভিত নড়ে গেল। তারা মুক্তিকামী বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। ১৬ই মার্চ ঢাকায় ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের বৈঠক শুরু হলো। আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও ঢাকায় এলেন। ২৪শে মার্চ পর্যন্ত চলল আলোচনার পর আলোচনা। কিন্তু সেই আলোচনায় কোনো সুরাহা হলো না। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ ঢাকা ত্যাগ করলেন। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে তিনি বলে গেলেন, 'অপারেশন সার্চ লাইট চালানো হোক।'

২৫শে মার্চ দিবাগত মাঝরাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এদেশের নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর ও রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টারে তারা অতর্কিত আক্রমণ চালাতে লাগল।

সেই রাতেই ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু ইংরেজিতে একটা ঘোষণা দিলেন। যার অনুবাদ হলো–

'এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারির মোকাবিলা করার জন্যে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাটি সারা দেশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। টেলিফোন, টেলিগ্রাম ও ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বাঙালি জাতি মহান নেতার এই ঘোষণাটি অবগত হলো। বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য উজ্জীবিত হয়ে উঠল। তারপর তিনি বাংলায় লিখে আরও একটা বার্তা প্রেরণ করলেন–

পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে পিলখানা ইপিআর ঘাঁটি, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস আক্রমণ করেছে এবং শহরের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে, আমি বিশ্বের জাতিসমূহের কাছে সাহায্যের আবেদন করছি। আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমি মুক্ত করার জন্য শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামে আপনাদের কাছে আমার আবেদন ও আদেশ দেশকে স্বাধীন করার জন্য শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। আপনাদের পাশে এসে যুদ্ধ করার জন্য পুলিশ, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনসারদের সাহায্য চান। কোনো আপোশ নাই। জয় আমাদের হবেই। পবিত্র মাতৃভূমি থেকে শেষ শত্রুকে বিতাড়িত করুন। সকল আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক প্রিয় লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দিন।

আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। জয় বাংলা।

সেদিনই রাত ১:৩০ টায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িতে এসে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করল। হায়েনারা প্রথমে তাঁকে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বঙ্গবন্ধুকে রাখা নিরাপদ বোধ করল না। তাই তিনদিন পর তারা তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গেল। ইয়াহিয়া খান এক ভাষণে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে বন্দি করে রাখল।

এদিকে ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো। স্বাধীনতা ঘোষণা করেই আওয়ামী লীগ নেতারা বসে থাকলেন না। ১০ই এপ্রিল তাঁরা বিপ্লবী সরকার গঠন করলেন। পরে ১৭ই এপ্রিল এই বিপ্লবী সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হলো। শপথ গ্রহণের ঐতিহাসিক স্থানটি হলো মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করা হলো। তাঁর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আর প্রধানমন্ত্রী হলেন তাজউদ্দীন আহমদ।

শপথ গ্রহণের পরই বিপ্লবী সরকারের নেতৃত্বে সারা দেশে তুমুল মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কৃষক-শ্রমিক, মাঝি-মজুর, ছাত্র-শিক্ষক, পুলিশ, আনসার, ইপিআর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য এবং মুক্তিপাগল জনতা জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলাম। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করে চলেছি।

সে সময় এদেশেরই কতিপয় কুলাঙ্গার সন্তান রাজাকার, আলবদর, আলশামস নাম নিয়ে মিলিটারিদের পক্ষ নিলো। তারা কোনোদিনও চাইত না যে বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হোক। বাংলাদেশ স্বাধীন হোক। তবুও বাংলা মায়ের গেরিলা যোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর রাতের ঘুম হারাম করে ছাড়ল।

আমি মুক্তিযুদ্ধে গেছি– এই খবর এলাকার রাজাকাররা কী করে যেন জেনে গেল। আমার খোঁজে তারা একদিন আমাদের বাড়ি এল। আমাকে না পেয়ে ওরা আমার মা-বাবাকে গুলি করে মেরে ফেলল।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস আমরা মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলাম। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। বিজয় যখন একেবারে সন্নিকটে, হানাদাররা বুঝতে পারল বাঙালির স্বাধীনতা কিছুতে দাবায়ে রাখা সম্ভব নয়, কাজেই দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করে ফেলতে হবে। যাতে এরা কোনোদিন বিশ্ব দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। ফলে ১৪ই ডিসেম্বর তারা রাজাকারদের দিয়ে এদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যায় মেতে উঠল। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা মেধাবী ও প্রতিভাবান শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, দার্শনিক, শিল্পী, চিকিৎসক, চলচ্চিত্রকার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের ধরে আনল। তাঁদের পেছন থেকে হাত ও চোখ বেঁধে ফেলল। তারপর বদ্ধভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করল।

তার দুদিন পরই প্রায় আটানব্বই হাজার সৈন্য নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজিত নেকড়ের মতো লেজ গুটিয়ে আত্মসমর্পণ করল। স্থানটা ছিল সেই রেসকোর্স ময়দান। আর তারিখটা হলো ১৬ই ডিসেম্বর। একাত্তরের সেই মুক্তিযুদ্ধে এদেশের প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহিদ হলো। দুলক্ষ মা-বোন সম্ভ্রমহানির শিকার হলেন। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর একসাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার আনন্দে আমার খুশি হওয়ার কথা। আমি তো প্রাণ খুলে হাসতেই চাই। বিজয়ের আনন্দে মেতে উঠতে চাই। কিন্তু পারি না।

এটুকু বলে হামিদ ভাই হঠাৎ ছোট্ট শিশুর মতো হুহু করে কেঁদে উঠলেন। আমি তার কান্না থামাবার চেষ্টা করি না। খানিকক্ষণ কেঁদে যদি তার ভারাক্রান্ত মন কিছুটা হালকা হয়, তাহলে হোক না, ক্ষতি কী!

শিশু অধিকার চাই

সাঈদ তপু

আমরা শিশু, তাই বলে কি কোনোই চাওয়া নাই?
পৃথিবীতে বেঁচে থাকার, সব অধিকার চাই
সবলভাবে বাঁচতে চাই সুস্থ দেহ, মন
স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাই সবুজ বনায়ন
সঙ্গে আরও খেলার মাঠ, সুস্থ পরিবেশ
গল্প, গানে যেমন ছিল সোনার বাংলাদেশ
তেমনটি নেই, আছে শুধুই দালানকোঠার বালাই
ইচ্ছে করে দম ফেলতে দূরে কোথাও পালাই
আবার ভাবি কোথায় যাবো? গাছ কেটে গাঁ ফাঁকা
গাছগাছালি, পাখপাখালি ছাড়া কি যায় থাকা?
বাসযোগ্য শিশু নিবাস চাই, আমাদের দাবি
আমরা হলাম এই পৃথিবীর ঐ আগামীর চাবি
যেমনটি চাই তেমন করে, তোমরা যারা বড়ো
পৃথিবীটা গড়তে হলে আজ আমাদের গড়ো
তবেই কেবল পৃথিবীতে বাজবে সুখের সানাই
দেশ ও দশের সবার কাছে এই মিনতি জানাই।

বাঙালির শোক

কমল চৌধুরী

ছয় দফা, বাহান্নর ধারাবাহিকতায়
ব্রিটিশ থেকে ভারত
ভারত থেকে পাকিস্তান
একাত্তরের রক্তাক্ত পথ বেয়ে
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ ঘোষণা ও অঙ্গুলির নির্দেশে
বাঙালি পেল লাল-সবুজের পতাকা
এবং পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ।
বিস্তৃত নয়নে দেখা অবারিত নীল দিগন্তে
আকাশ প্রদীপের মতো বাংলার আকাশে
অন্তহীন অনন্ত নক্ষত্র বীথিমালায়।
অথচ পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট কালোরাত্রিতে
তেজস্বী, ক্ষিপ্র মীরজাফরের দল
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার
ব্রাশফায়ারে হত্যা করল।
ঘাতক দানবের শুধুই উল্লাস নয়
তারা রক্তের ভিতরে ঢালে খেদ
শিশু রাসেলের কোমল মুখশ্রী
ভরে যেন সূর্যাস্ত ছড়ানো
রাসেল তার মায়ের কাছে যেতে চায়
মৃত্যুদানবের কূটকৌশল হাসি
তোমাকে তোমার মায়ের কাছেই নিয়ে যাচ্ছি
মৃত্যুদূত চিরতরে নিয়ে যায় রাসেলকে।
শোকের কাঁটা ফুটে আছে বাঙালির রক্তাক্ত হৃদয়ে।
এ শোক যেন শক্তিতে পরিণত হয়েছে
সমস্ত বাঙালির অন্তরে চিরতরে॥

রাসেলের জন্য

অমিত কুমার কুণ্ডু

রাসেলের হাসি কেড়ে নিলো যে পাষাণ
তাদের দম্ভ ভেঙে হোক খান খান
তারা কাপুরুষ তারা নরকের কীট
খুলে দাও সে হীন-এর মুখোশের গীট।
প্রতিশোধ নিতে হবে দৃঢ় প্রত্যয়ে
পিশাচ থাকুক আজ ঘোরতর ভয়ে
দানবের মাটি হোক আগুনের পাত
সবাই পুড়িয়ে দাও পাষাণ ঐ হাত।
হে বিবেক জেগে ওঠো প্রতিবাদে নাম
দস্যু নিপাত হলে তবে তুমি থাম
অসুরের দেশ নয় এ বাংলাদেশ
প্রেতের পতন হলে কাজ হবে শেষ।

রাসেলের সাথে দেখা

ইউনুছ আলী

চলনবিলে ঘুরতে গেলে
হঠাৎ দেখি এ কী!
অদ্ভুত এক পাখি বসে
করছে লেখালেখি!

ডানা দুটো রং-বেরঙের
সোনার জুতো পায়ে,
বলল হেসে, 'এদিক কেন?
কোন সে অভিপ্রায়ে?'

পাখির কথায় শূন্য মাঠে
কাঁপছি থরথর,
বলল পাখি, 'ভয় করো না;
হাতটা আমার ধরো।'

ধরতে গেলে হাতখানা তার
চমকে গেলাম আরও,
পাখিতো নয়, পুরাই মানুষ;
বিরাট তাহার ঘাড়ও!

বলল হেসে, 'ঘাবড়াবে না,
আমিই রাসেল ভায়া,
পাখি রূপে অনন্তকাল–
ছড়িয়ে দিব মায়া!'

বঙ্গবন্ধুর মতো হতেন চির স্বাধীনচেতা

আবীর আহাম্মদ উল্যাহ

মায়ের কাছে যাবে বলে
শিশু রাসেল কাঁদে
পাষাণ ঘাতক হত্যা করল
বিনা অপরাধে।
যাদের একটু হাত কাঁপল না
মারতে অবুঝ শিশু
সব ধর্মেই তাদের বলে
'লাল রক্ত পিপাসু'।
বিশ্ববিবেক কেন সেদিন
করেনি তার বিচার
তবে ঘটিত না এমন
নারকীয় কাণ্ড আর।
কী করে আজও আছে
লুকিয়ে বিদেশে
কুচক্রীদের দেয় না কেন
পাঠিয়ে এদেশে।
এ পাপ থেকে মুক্তি পেতে
সব জনতা মিলে
যাদের বিচার হয়নি আজও
ধরব তাদের পেলে।
রাসেল হতো সবার চেয়ে
হতেন দক্ষনেতা
বঙ্গবন্ধুর মতো হতেন
চির স্বাধীনচেতা।

কাল্পনিক প্রেমের বিশালতা

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ্

খুঁজেছি তোমায়–
কৈশোর থেকে যৌবন অবধি।
তুমি রূপবতী ক্লিওপেট্রা অথবা
কঙ্কাবতী।
তুমি সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সমতুল্য।
তোমার প্রেমের লেলিহান শিখা
জয়ের নেশায় সদামত্ত।
প্রেমের নব আঙ্গিকে রূপায়িত
হাজার কল্পনা আর স্বপ্নের রজনি।
তুমি নিত্য জাগরুক,
তুমি সকল প্রেমের মণিহার।
আজ আমি রিক্ত-সিক্ত
ব্যাকুল চয়ন সমাহার,
স্বপ্নের সম্রাট রজনির ভাবুক
হেমন্তের নবান্ন চৈতন্য।
তোমার বিরহে অবারিত মন
সদা জাগরুক।
কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করি
তোমাকে পাইনি খুঁজে
তুমি বিশ্ব নন্দিত লাখো আত্মার খোরাক।
আমার আকাঙ্ক্ষিত ভাবনা
তাই তুমি চির অবিনশ্বর।

জ্যোতি স্নানে

আশানূর আইরিন আশা

বত্রিশ নম্বর বাড়ির সামনে
বাগানে ফুলের ঘ্রাণে
নিস্পন্দ প্রাণের টানে
রক্তভেজা ফাগুনে
আত্মচিৎকার আসে কানে।

হাজার তারার স্বপ্ন জানে
রক্ত জানে শব্দ জানে,
চন্দ্র, সূর্য সবাই জানে
রাসেল বিদায় বিষাদ গানে
বঙ্গশিশু জ্যোতি স্নানে।

নদীর জলের মতো ঘুম

বাদল ঘোষ

ঘুম ঘুম প্রজাপতি সুখের নিদ্রায়–
ঘুম ওড়ে নিবিষ্ট ডানায়
প্রজাপতি সুখের নিদ্রা যায়

বিচিত্র রঙের ঢেউ সাগর ডানায়

প্রজাপতি ওড়ে পাখা খুলে যায়
রং খসে পড়ে
ঘুম ঘুম প্রজাপতির ডাগর
চোখ যায় খোয়া–

নদীর জলের মতো ঘুম নামে
ভাসে প্রজাপতি সেই ঘুম জলে ...

ঢেঁকি

অতনু তিয়াস

গাছটাকে হত্যা করতেই একপশলা বৃষ্টি ঢলে পড়ল ঘুমে
নাব্যতার খোঁজে বয়ে চলা নদী স্রোত হারিয়ে
মাঝপথে গেল থেমে।

গাছের বুক বরাবর চলছে করাত
আর্তনাদে ঝাঁঝাঁ রোদ্দুর পেরিয়ে
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস তপ্ত হয়ে ওঠে
নেমে আসে বিষণ্ন রাত
পরিচয় পালটে দিয়ে
গাছের গল্প হয় অন্যরকম–
আলতাপায়ের পাড়ে গেরস্তের ব্যস্ত ওসারায়
মাথা তুলে জেগে ওঠে ঢেঁকি শিরোনামে
হয়ে ওঠে কর্মমুখর পুনরায়।

ধীরে ধীরে আলতা রং পা বদলায়
প্রতিটি পায়ের গোছা দিনে দিনে শীর্ণ হয়ে আসে
হাজারো নবান্নকে কুর্নিশ করে অবসন্ন ঢেঁকি
অবশেষে বাড়া ভানতে স্বর্গে চলে যায়।

বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যা রাতে

মুহাম্মদ ইসমাঈল

সন্ধ্যা নেমেছে কিছুক্ষণ আগে। আষাঢ় শেষ। শ্রাবণের আকাশজুড়ে কালো মেঘের ঘনঘটা। হয়ত বৃষ্টি নামবে আজ। আকাশ ঝরাবে বিরহ অশ্রু। মুছে দেবে সব দুঃখ, যন্ত্রণা ও বেদনা।

সাগর ফার্মগেটের সরু একটা গলি দিয়ে আনমনে হাঁটছে। গায়ে চেক পাঞ্জাবি, চোখে কালো চশমা। কাঁধে ঝুলছে সাহিত্যিকদের ব্যাগ। হাতে কবিতার বই। কবিতা, ছড়া, গল্প আরও হাবিজাবি সব কাগজপত্র রাখা ব্যাগে। সময় পেলেই বই পড়ে। ছড়া, কবিতা লিখে ভাবনাগুলো ছড়িয়ে দেয় কাগজে।

নির্জন পথে কবিতা আওড়াতে আওড়াতে এগুচ্ছে সে। বেশ ভালোই লাগছে। ঢাকা শহর আগের মতো নির্জন নয়। আগে চলাফেরাতে আরাম ছিল। খাওয়াদাওয়াতে আরাম ছিল। লেখালেখিতে আরাম ছিল। এখন সবখানে কোলাহল। নির্জন জায়গা না হলে কবিতা আসে না। ছড়া আসে না, গল্পের প্লট তৈরি হয় না। উপন্যাসের বড়ো প্লট তৈরি হয় না। তাই একটু সময় পেলে সাগর বেরিয়ে পড়ে নির্জনতার খোঁজে। এ সময় নামল অঝোরে বৃষ্টি, সেই সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। সাগর দৌড়ে একটা ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল। ফ্ল্যাটের নীচতলায় রুমের দরজা খোলা। ভেতরটা কুচকুচে কালো অন্ধকার। হয়ত বিদ্যুৎ নেই। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাতাসের ঝাপটায় সাগর ভিজে যাচ্ছে। ভদ্রতার খাতিরে অপরিচিত ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়তে পারছে না। এ সময় দরজার আড়াল থেকে একটা নারীর মায়াবী কণ্ঠ ভেসে এল। এখানে দাঁড়িয়ে তো ভিজে যাচ্ছেন। ভেতরে আসুন। সাগর ছাতা সঙ্গে নেয়নি। সাহিত্যিকরা এমনই একটু আনমনা হয়। তারা সৃষ্টির কাজে ব্যস্তই থাকেন। নিজের খেয়ালও তারা রাখেন না। সাগর ঘরে ঢুকে পড়ল। বাইরের আবছা আলো ঘরের ভেতরটা কিছুটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তিনি সাগরকে সোফায় বসতে বলল। সোফায় বসার পর সাগর জিজ্ঞেস করল, বাসায় আর কেউ নেই? গৃহকর্ত্রী এক রকম হতাশ গলায় বলল, বাসায় আমি একাই থাকি।

কিছু মনে করবেন না, বাসায় মোমবাতি বা চার্জার এ জাতীয় কোনো লাইট নেই। কিছুক্ষণ আপনাকে কষ্ট করে বসে থাকতে হবে। সাগর ভদ্রতা দেখিয়ে যদিও বলল, আচ্ছা, সমস্যা নেই। কিন্তু এমন বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় অন্ধকার কক্ষে একটা নারীর সামনে বসে থাকতে বেশ অস্বস্তি লাগছে কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করল না। দুজনে চুপচাপ বসে আছে কোনো কথাবার্তা নেই। নিস্তব্ধতায় এগোতে থাকল সময়ের প্রহর। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে এল। দুজনে দুজনার পরিচিত মুখ দেখে চমকে উঠল। বিস্ময়ে সাগর হালকা আর্তনাদের মতো বলল, সোনিয়া তুমি!

সোনিয়া সাগরকে দেখে এতটাই ধাক্কা খেয়েছে যে, তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সাগরের দিকে। ঠোঁট কাঁপছে তার। চোখ টলমল করছে পানিতে। হয়ত এখনই শ্রাবণের ধারা বইবে।

সাগর যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তখন থেকেই কাব্যচর্চা করত। জাতীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশ হতো তার লেখনী। সবার থেকে আলাদা হয়ে কবিতার পেছনেই কাটাত সময়। সাহিত্য আড্ডায় যেত। সোনিয়া সাগরের ক্লাসে পড়ত। রূপে-গুণে ও কথায় সে ছিল অনন্যা। সাগরের বহুমুখী প্রতিভা, কাব্যচর্চা দেখে সে সাগরের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। ভালোবাসার দোলনায় দুলতে থাকে দুজন। সাগর সোনিয়াকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো। এগুতে থাকে তাদের সুখের দিনগুলো। কিন্তু তাদের এই সুখ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সোনিয়া হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ধনীর দুলালের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এতটা ভালোবাসার পর সোনিয়া ওকে ছেড়ে যাওয়ার কারণ হাজারো চিন্তা করে সাগর বুঝতে পারল না।

অনেক দিন পর সাগর কবিতার বইয়ের ভাঁজে সোনিয়ার একটা চিরকুট পায়। এতে লেখা ছিল, আমি ভেবে দেখলাম, তোমাকে বিয়ে করলে কোনো দিন সুখ পাবো না। তোমার তো কোনো অর্থসম্পদ নেই। কবিতা বিক্রি করে আমাকে খাওয়াবে। কবিতার তো কাটতি নেই, তাই তোমাকে ছেড়ে গেলাম, পারলে ক্ষমা করে দিও– সোনিয়া।

সাগর অনেক চেষ্টা করে সোনিয়াকে ভুলতে। কিন্তু পারল না। ক্ষণে ক্ষণে স্মৃতিগুলো সাগরকে দিত পাহাড়সমান যাতনা। হাজারো কষ্ট বুকে ধরে একাকী পার করে দিলো দশটি বছর। এত দিন পর সোনিয়ার সঙ্গে এমন আকস্মিক দেখা হবে, কোনোদিনও ভাবেনি সাগর।

সোনিয়া মাথা নিচু করে কাঁদছে। সাগর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল– কেমন আছ? কেমন চলছে তোমাদের সংসার ? সোনিয়া আহত গলায় বলল, যে ধনীর দুলালের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলাম তাকে খুব ভালো লাগছিল প্রথমদিকে। মনে হয়েছিল ভালো। সংসারের এক মাসের মাথায় সে পালিয়ে গেল আর ফিরে এল না। অনেক খুঁজেছি পাইনি তাকে। আমার রূপ এবং মোহ কেটে গেছে তার কাছে। এজন্য সে পালিয়েছে। বাড়িতে না জানিয়ে বিয়ে করায় সেখানেও উঠতে পারিনি– বাবার ভয়ে, ভাইদের ভয়ে।

বাবার অনেক ইচ্ছে ছিল, মেয়েকে দেখেশুনে বিয়ে দেবে। ভাইদেরও আদরের বোন ছিলাম, তারা বোনকে নিয়ে অনেক গর্ব করত। একমাত্র বোনকে ভালো জায়গায় ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেবে। সব কিছু হারালাম।

ধনীর ছেলেদের ভালোবাসা সাময়িক। আমাদের মেয়েদের সেটা বুঝা উচিত। সবচেয়ে মোদ্দা কথা অভিভাবক ছাড়া কখনো ছেলেমেয়েদের বিয়ে করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে কেউ কাউকে কিছু বলতেও পারে না, শুধু চাপা দুঃখ নিয়ে দিনের পর দিন কষ্ট পায়। এসব কথা বলতে বলতে অশ্রুসিক্ত নয়ন আড়ালে মুছে আবার বলতে লাগল, এখন একটা এনজিওতে কোনোরকম চাকরি করে দিনাতিপাত করছি। তোমার অবস্থা বলো, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কেমন আছ?

সাগর বলল, আমি এখনও বিয়ে করিনি। একবার কাউকে ভালোবাসার পর আর অন্য কাউকে ভালোবাসা যায় না।

খুশিতে ঝলমল করে উঠল সোনিয়ার দুটো চোখ। সাগরের ডান হাতটা চেপে ধরে আপ্লুত গলায় বলল, আবার আমরা নতুন করে জীবন গড়ি।

দুর্নীতিকে না বলুন

দুর্নীতিকে না বলো
সৎপথে এগিয়ে চলো

গল্পটা শারদসন্ধ্যার

কামাল হোসাইন

একটা সময় ভীষণ আকাশ হতে ইচ্ছে করত আমার,
যে আকাশে কেবল তুমিই তারা হয়ে জ্বলবে; আর সেই
ঝিকিমিকি আলোর বানে আমরা ভেসে যাব অনন্তলোকে।

আমার ভেতরের কথামালা কীভাবে যেন পড়ে ফেললে তুমি।
বললে, তারকা হবার মোটেও ইচ্ছে নেই তোমার;
বরং এক আকাশ মেঘ হয়ে আমাকে ভিজিয়ে দেবার ইচ্ছেটা
তখনও মরে যায়নি তোমার!
আমি বললাম, আর সে আকাশের বৃষ্টি থামিয়ে হঠাৎ রংধনুর সাতরঙে
তোমায় রাঙিয়ে দিতে বড্ড লোভ আমার!

তুমি হাসলে নির্বিকার।
যে হাসির অর্থ সত্যিই আমার বোধগম্যের বাইরে ছিল।
ফলে আমি তোমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

ধ্যান ভাঙিয়ে তুমি আমার চিবুক ছুঁয়ে বললে
উঁহু, আমি তোমার শারদসন্ধ্যার ঝলমলে চাঁদ হবো,
গল্প শোনাবো অনন্তকালের, যতক্ষণ না প্রভাত আসে, পাখিদের কার্নিশে।

শান্তিময় বসুন্ধরা

রতন চন্দ্র পাল ভৌমিক

শরতের ঐ কাশফুলে দোলা লাগে
মায়ের আগমনী বার্তা শিউলি ফোটা গন্ধে
শ্বেত-শুভ্র মেঘেরা ভেসে ভেসে
মহালয়ার আগমনী সুর ও ছন্দে।
উমা এল– সাথে এল সকলে
অসুর নাশিতে মর্তে এল দুর্গা মা,
হিমালয় কন্যা এল পিত্রালয়ে
পিতৃপক্ষ শেষে মাতৃপক্ষের শুরুতে।
চারদিকে বাজছে আজ ঢাক, ঢোল
কাসর, ঘণ্টা, চণ্ডী পাঠের সুরলহরী
সমগ্র ধরাধামে মা তাই বরণে, স্মরণে
মাতোয়ারা উৎসব আনন্দে এ ধরা।
মাতৃবন্দনার দিনে কতই না আনন্দ উৎসব
ধরায় এল মা বাহন গজেতে,
সুখ-শান্তি শস্যপূর্ণ বসুন্ধরা
নৌকায় যাবেন মা, ফল–শস্য বৃদ্ধি জলবৃদ্ধি এই ধরা।
শুরু হয় মাতৃপক্ষে মহালয়ায়– পূর্বপুরুষের
তিল-জল তর্পণ দানে শান্তি-আবাহনে
সর্বজনীন আরাধনায় মায়ের কাছে সমর্পিত হৃদয়-মন
সুখ-শান্তি দাও মা, শান্তিময় হোক বসুন্ধরা।

এখন আমার ছায়াটাও খুঁজে পাই না

রকিবুল ইসলাম

আজন্ম কপাল পোড়া মানুষ আমি
ভালোবাসি এই মাটিলেপা ঘরবাড়ি-উঠোন ...
মায়ের সঙ্গে জীবনে প্রথম বন্ধুত্বের শুরু
আস্তে আস্তে পৃথিবীর মায়ায় জড়িয়ে
বাড়তে থাকে সম্পর্কের শিকল ...
নিজেকে অতি প্রয়োজনীয় ভাবতে থাকি।

সম্পর্কের শিকল বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে...
পৃথিবীর মায়া বাড়তেই থাকে, বাড়তেই থাকে...

এক সময় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো
হারাতে লাগলাম প্রিয় যত স্বজনের সাহচর্য।
হারাতে হারাতে একা হয়ে গেলাম
এখন আমার ছায়াটাও খুঁজে পাই না ...

স্বস্তির খোঁজে

আলম শামস

তেপান্তর পেরিয়ে
দিগন্তের ওপার থেকে
ক্লান্ত দেহে
ঘরে ফিরে
খুঁজি স্বস্তি
আদরের কোমল পরশ

চেয়ে দেখি ভালোবাসার ভিখারি
দুহাত বাড়িয়ে আছে
সোনালি আয়োজনে।

মাছ হাঁস ধান চাষ

মো. মাজহারুল হক

ধানের ক্ষেতে করব মোরা
মাছের চাষ।
ক্ষেতের পাশে খামার করে
চরাও হাঁস।
ধান পাবে, মাছ পাবে, আরও পাবে
বাড়তি আয়।
খাদ্য পাই, অর্থ পাই, আরও
কত পুষ্টি পাই।
হাঁসে খাবে ধানের পোকা
দেওয়া লাগে না বিষ।
ডিম পাবে মাংস পাবে
আরও পাবে প্রাণিজ আমিষ।
হাঁসের বিষ্ঠা মাছের জন্য
সরাসরি উত্তম খাদ্য,
বাড়তি খাবার খুব লাগে না
দিতে পারে একটু আর্দ্র।
মাছ এবং হাঁস মিশ্রভাবে
চাষি করলে চাষ।
বেড়ে উঠবে ধানের গাছ
পুষ্টি পাবে বারো মাস।

রাসেল কোনো রাজনীতি নয়

জোবায়ের জুবেল

রাসেল কোনো রাজনীতি নয়
ছোট্ট একটা শিশু,
যার বিবেকের বোধ আছে সে
ধরবে না এই ইস্যু।

রাসেল কোনো দলের নাম না
বাংলাদেশের ছেলে,
যার হৃদয়ে শোক আছে সে
ভাসবে চোখের জলে।

রাসেলের শুভ জন্মদিন

আমিনা খাতুন দিপা

শিশু তুমি শেখ রাসেল ঐ
জান্নাতেরই ফুল,
জালিমেরা তোমায় মেরে
করল একি ভুল!

শিশু দিবস জন্মদিবস
তোমায় স্মরণ করি,
হাজার শিশুর মাঝে আমি
তোমার মিনার গড়ি।

শিউলি ফুলের মতো তুমি
ঝরে গেছ ঠিক,
এখনও তো গন্ধ বিলাও
মাতাল চারদিক।

পথশিশু সবার মাঝে
বাজে খুশির বিন
রাসেল তোমায় স্মরণ করি
শুভ জন্মদিন।

ছোট্ট খোকা রাসেল

জিশান মাহমুদ

ছোট্ট খোকা রাসেল সোনা
টুঙ্গিপাড়ায় থাকত
পড়ার ফাঁকে সময় পেলেই
গাঁয়ের ছবি আঁকত।
লেখাপড়ায় ভালো ছিল
কথা বলত হেসে
খেলতে খেলতে হারিয়ে যেত
প্রজাপতির দেশে।
সদা হাসি লেগে থাকত
শেখ রাসেলের মুখে
মনটা ছিল ফুলের মতো
মায়া ছিল চোখে।
এটা-ওটা বায়না করে
বলত বাবা-মাকে
পঁচাত্তরের আগস্ট মাসে
হারিয়ে ফেলি তাকে।
ওপার দেশে চলে গেলে
জগৎ করে কালো
বেহেশতেরই ফুল বাগানে
থাকো যেন ভালো।

বাংলাদেশের কন্যা

শাহরিয়ার শাহাদাত

ফুটবল মাঠে কারা যেন ওরা
ছড়ালো জয়ের বন্যা?
লাল-সবুজের জার্সি গায়ে
বাংলাদেশের কন্যা!

সব প্রতিকূলতা ছাপিয়ে গিয়ে
বাঙালি মেয়েরা আজ
লড়াই করে ছিনিয়ে আনলো
জয়ের মুকুট তাজ।

ফুটবল মাঠে বিশ্ব কাঁপালো
নারী ফুটবল দল
তুখোড় বাঙালি মেয়েরা যেন–
বাঘিনী অবিকল!

আকাশ ছোঁয়ার বাসনা বুকে
মানবে না তারা হার
প্রতিপক্ষের গোলবার গুড়িয়ে
করে দিলো চুরমার।

দস্যিপনা মেয়েরা দেখালো
নিজেদের গুণধার
ওরা আমাদের গর্বিত নারী
এদেশের অহংকার।

সাবিনা, রুপনা, ঋতুপর্ণা বা
মারিয়ার নেই ভয়
লাল-সবুজের পতাকা মানেই
জয় বাংলার জয়।

শরৎ ঋতু

মহিউদ্দিন বিন জুবায়েদ

শরৎ ঋতুর প্রতিটি ছাপ
ঘাসের গতরজুড়ে
কাশফুলেরা হাতছানিতে
ডাকছে বহুদূরে।

ঘাসের পাতায় শরৎ ঋতু
করছে মাখামাখি
মন ভরে যায় দৃশ্য দেখে
জুড়ায় দুটি আঁখি।

পুবের বায়ু কাশের বনে
দোল দিয়ে যায় রাতে
কুয়াশাতে গতর ভিজে
শরৎ ঋতুর সাথে।

শরৎ ঋতু সবার প্রাণে
ঢেউ ছাড়া এক নদী
নানান ফুলের সমাহারে
চলছে নিরবধি।

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ। বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে প্রয়োজন শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ নিয়েছে। রাষ্ট্রপতি ৮ই সেপ্টেম্বর 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে এসব কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী সব শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিনামূল্যে শিক্ষাদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং চালু ও পাঠদানের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আনন্দদায়ক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় শিক্ষাদানের আওতায় নিয়ে আসা এবং ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪'-এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মানবসম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশ যুবসমাজ

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকাল। মানবসম্পদের শ্রেষ্ঠ অংশ যুবসমাজ। বাংলাদেশের সব আন্দোলন, সংগ্রাম ও অগ্রগতির পথে এদেশের যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। ১১ই সেপ্টেম্বর 'শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২' প্রদান উপলক্ষে দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, মহান ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবকরা যেমন জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেনি, তেমনি দেশকে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে যুবসমাজকে অগ্রসৈনিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে যুবসমাজের জন্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও উদ্ভাবনী উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, দেশ গড়ার হাতিয়ার যুবকদের শানিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন যুব সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যুবকদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, আত্মকর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা তৈরি ও যুব সংগঠন নিবন্ধন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যুব সম্প্রদায়কে এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন পূরণে দেশপ্রেম, কর্মে একাগ্রতা, সাহস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি।

প্রতিবেদন: মিতা খান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে ১০ই অক্টোবর ২০২২ বঙ্গভবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করে। এসময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষের প্রকাশনা রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন– পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব সেতু উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিরোজপুরে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু' উদ্‌বোধন করেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে চামেলি হল থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি এই সেতুর উদ্‌বোধন করেন। এসময় তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য দেশকে আরও উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া। দেশে উন্নয়নের যে অদম্য গতি সেটা অব্যাহত রাখতে চাই। সেজন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকার কাজ করছে।

পিরোজপুর জেলার বরিশাল-খুলনা আঞ্চলিক মহাসড়কের বেকুটিয়ায় কচা নদীর উপর নির্মিত এই সেতু উদ্‌বোধনের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের একটি স্বপ্ন পূরণ হলো এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরও একটি নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হলো। কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত এবং গভীর সমুদ্রবন্দর পায়রার সঙ্গে দেশের ২য় সমুদ্রবন্দর মংলা ও সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর বেনাপোল এবং সর্বোপরি পিরোজপুরের সঙ্গে ঢাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হলো। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১৯শে মার্চ পিরোজপুরের এক জনসভায় কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৮ সালের ১লা নভেম্বর ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণকাজের উদ্‌বোধন করেন তিনি।

চা শ্রমিকরা ভূমিহীন থাকবে না

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতা চা শ্রমিকদের ভোটাধিকার দিয়েছেন। এরপরও তারা ভূমিহীন থাকবে, এটা হতে পারে না। অন্যসব নাগরিকের সঙ্গে তাদেরও ভূমির

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই অক্টোবর ২০২২ তাঁর কার্যালয়ে চামেলি হল থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ ও নড়াইলের মধুমতি সেতু এবং নারায়ণগঞ্জের বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমান ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু উদ্‌বোধন করেন– পিআইডি

ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে। ৩রা সেপ্টেম্বর সিলেটের লাক্কাতুরা গলফ ক্লাব মাঠে চা শ্রমিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন তিনি। এসময় চা শ্রমিকদের কাছ থেকে সোনার চুড়ি উপহার পেয়েছিলেন জানিয়ে এ ঘটনায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনারা গণভবনে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় উপহার নিয়ে এসেছিলেন। সেই উপহার এখনও আমি হাতে পরে বসে আছি। আমি কিন্তু ভুলিনি। আমার কাছে এটা হচ্ছে সব থেকে অমূল্য সম্পদ।

রামপাল বিদ্যুৎসহ পাঁচ প্রকল্পের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খুলনার রামপালে মৈত্রী সুপার তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। রামপাল ছাড়া অন্য প্রকল্পগুলো হলো– রূপসা রেলসেতু উদ্‌বোধন, বাংলাদেশের সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের জন্য নির্মাণ সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি হস্তান্তর, খুলনা-দর্শনা রেলপথ এবং পার্বতীপুর-দর্শনা রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প। ৬ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভার্চুয়ালি প্রকল্পগুলো উদ্‌বোধন করা হয়। ভারতে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের দ্বিতীয় দিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও একান্ত বৈঠকের পর তাঁরা একইসঙ্গে প্রকল্পগুলো উদ্‌বোধন করেন। এরপর যৌথ বিবৃতি দেন দুই প্রধানমন্ত্রী। এর আগে কুশিয়ারা নদীর পানি প্রত্যাহার, রেলের আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মহাকাশ গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা এগিয়ে নিতে সাতটি সমঝোতা স্মারকও সই হয় এদিন। উভয় দেশের কর্মকর্তারা এসব সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

বাংলাদেশ কোভিড মহামারি মোকাবিলায় সফল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্মিলিত এবং সময়োপযোগী প্রচেষ্টা কোভিড-১৯ মহামারির সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে পারে। বাংলাদেশ সফলভাবে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলা করেছে এবং অনেক জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে, মহামারির কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষ মারা যাবে। ১০ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সোসাইটি অব অ্যানেস্থেসিওলজিস্টস ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড পেইন ফিজিশিয়ানস আয়োজিত 'ব্যথা সম্পর্কিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০২২ এবং ব্যথা বিষয়ে সাম্প্রতিক অগ্রগতি বিষয়ক সপ্তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০২২'-এ সম্প্রচারিত ভাষণে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী আশা করেন এই সম্মেলন সর্বশেষ গবেষণার তথ্য ও কৌশল শেয়ার করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে এবং ব্যথা, ব্যথার ওষুধ, মূল্যায়নের সরঞ্জাম এবং ব্যথা ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আন্তর্জাতিক গবেষকদের জন্য একটি ফোরাম গঠনে সহায়তা করবে।

যুবসমাজ উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তুলবে

দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে তরুণ ও যুবকদের দক্ষ করে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যুবসমাজ দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলে এদেশের প্রত্যেকটা মানুষ যেন সুন্দর জীবন পায়, আমরা সেই পথে এগিয়ে যাব। ১১ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে 'শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২' বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তরুণসমাজটা হচ্ছে একটা জাতির জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই সেই সমাজটা শিক্ষায়-দীক্ষায় সব দিক থেকে উচ্চমানের হবে, আমি সেটাই চাই। আমাদের যুবসমাজ, এটা আমাদের বড়ো একটা শক্তি। পৃথিবীর অনেক দেশ এখন বয়োবৃদ্ধদের দেশে পরিণত হয়েছে। আমরা সেটা হতে চাই না। এবছর ১১ জনকে 'শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২২' দিয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। ঢাকার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়: বিশেষ প্রতিবেদন

প্রতিভা বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, তারুণ্যের প্রতিভা বিকাশে খেলাধুলার বিকল্প নেই। খেলাধুলা যেমন শরীরকে সুস্থ-সবল রাখে, তেমনি মনকেও প্রফুল্ল রাখে, প্রশস্ত করে। ১৮ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর কুড়িলে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল

ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এআইইউবি মাঠে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের কাবাডি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ২রা অক্টোবর ২০২২ পঞ্চগড়ের করতোয়া নদীতে নৌকাডুবিতে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের মাঝে ত্রাণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন এসময় উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সোনার মানুষ প্রয়োজন। আর দেশাত্মবোধ, মমত্ববোধ, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, মেধা-মনন-শিল্প-ক্রীড়াচর্চা সোনার মানুষ গড়ার হাতিয়ার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি এই মানবিক মূল্যবোধের চর্চাতেও অগ্রণী হতে হবে। এবছর বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপের বিভিন্ন খেলাধুলায় দেশের ১২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সাত হাজার প্রতিযোগী অংশ নেয়।

'জনতার সরকার' পোর্টাল উদ্‌বোধন

আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর সার্কিট হাউসে তথ্য ভবন মিলনায়তনে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ আয়োজিত 'জনতার সরকার' সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল (janatarsarkar.gov.bd) উদ্‌বোধন করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সভাপতিত্বে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ সভায় বক্তব্য দেন। মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রচনার লক্ষ্যে জীবন দিয়ে এদেশ রচনা করে গেছেন। কিন্তু আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তখনই হোঁচট খায় যখন ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবার হত্যা করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, জনতার সরকার সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল দেশের সাধারণ জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে গণতান্ত্রিক চর্চাকে বিকশিত করে উন্নত গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে এটি তৈরি করা হয়েছে উল্লেখ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে জনগণ গঠনমূলক সমালোচনা বা পরামর্শ কিংবা সুপারিশ করতে পারবে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া জানাবে যা আপাতত প্রতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিবর্গ ও সচিবদের কাছে পাঠানো হবে। ইতোমধ্যেই সরকারের ১১টি মন্ত্রণালয় এই পোর্টালে যুক্ত হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ৫৬টি মন্ত্রণালয়কে যুক্ত করে এই প্রতিবেদনটি প্রতিদিন একবার সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। জনতার সরকার পোর্টালটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টারের আওতায় পরিচালিত হবে।

তথ্য সার্ভিস জনগণ ও সরকারের সেতুবন্ধ রচয়িতা

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সরকারের তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছানো এবং জনগণের মতামত সরকারকে প্রদানের মাধ্যমে তথ্য সার্ভিসের সদস্যরা জনগণ ও সরকারের সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে চলেছেন। এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে দিন পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রযুক্তির লাগসই ব্যবহার প্রয়োজন। ১৫ই সেপ্টেম্বর রাজধানীর সার্কিট হাউসে তথ্য ভবনে বিসিএস ইনফরমেশন অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা উল্লেখ করেন। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক স. ম. গোলাম কিবরিয়া এতে সভাপতিত্ব করেন। অ্যাসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি গণযোগাযোগ অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. জসীম উদ্দিন সভায় বক্তব্য দেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, তথ্য সার্ভিসের সদস্যরাই রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতে জনসংযোগের দায়িত্ব পালন করেন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনলাইন প্রশিক্ষণ'-এর উদ্‌বোধন

'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনলাইন প্রশিক্ষণ'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান ১৩ই সেপ্টেম্বর ২০২২ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী ডা. দীপু মনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আবু বকর ছিদ্দীক এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. কামাল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি),

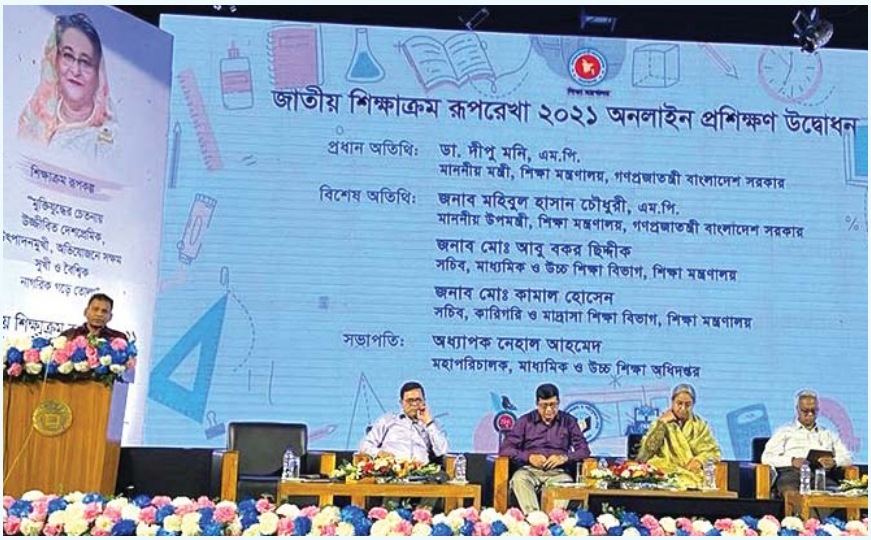

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং এটুআই-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ।

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রণীত নতুন 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১'-এর দর্শন, রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সকল শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের অবহিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে এনসিটিবি ও মাউশি কর্তৃক সকল শিক্ষককে সরাসরি প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি মুক্তপাঠের মাধ্যমে অনলাইন প্রশিক্ষণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। শিগগিরই বাংলা ভাষার সবচেয়ে বড়ো ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'মুক্তপাঠ' (www.muktopaath.gov.bd) প্ল্যাটফর্মে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনলাইন প্রশিক্ষণ' শীর্ষক কোর্সটি https://muktopaath.gov.bd/course-details/892 এই লিংকে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষকদের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এছাড়াও শিক্ষাক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ও ইস্যুভিত্তিক এনসিটিবি ও মাউশি-এর নতুন নতুন অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্মে চালু করা হবে।

শিখন ঘাটতি পূরণ করবে 'ফ্লেক্সিবল লার্নিং প্যাকেজ'

করোনাকালে দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি কমিয়ে এনে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাসের মূল ধারায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে 'ফ্লেক্সিবল লার্নিং প্যাকেজ'। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ রিসোর্স মডিউলটি তৈরি করেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও বাস্তবায়নকারী পার্টনার সংস্থা সুরভি। ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২২ সিরডাপ মিলনায়তনে প্যাকেজটি উদ্‌বোধন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর–মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদ। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের 'চাইল্ড ব্রাইড টু বুকওয়ার্ম' প্রকল্পের আওতায় এই মডিউলটি ঢাকার ২২টি মাধ্যমিক স্কুলে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে ব্যবহার করা হবে। প্যাকেজটিতে মোট তিনটি বিষয় (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঢাবির ১১ শিক্ষার্থী পেলেন অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০২০ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল করায় ১১ জন শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। ২০শে সেপ্টেম্বর ঢাবির অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন– ইশরাক সাব্বির নির্ঝর, অরিন আহমেদ মিতু, ইশরাত জাহান প্রমি, জোবায়ের আহমেদ, কৌশিক এইচ হায়দার, মীর সাদ্দাম হোসেন, মো. মুজাহিদুল ইসলাম, আবু নোমায়ের সাদ, তাসনোভা আরেফিন, জান্নাতুল নাঈম পিয়াল এবং তামারা ইয়াসমিন তমা।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

মাংস জাতীয় পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা

হালাল মাংস রপ্তানিতে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে সরকার ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দিচ্ছে। চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নগদ সহায়তা পাবে এমন তালিকায় এবার মাংস থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত পণ্য যুক্ত হলো। এ খাতে রপ্তানির বিপরীতে ২০ শতাংশ পর্যন্ত নগদ সহায়তা পাবেন উদ্যোক্তারা। ১৯শে সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা ও নীতি বিভাগ 'রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা বা নগদ সহায়তা' সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, চলতি ২০২২ সালের ১লা জুলাই থেকে ২০২৩ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়ে বস্ত্র খাতের পাঁচটি উপখাতসহ ৪৩টি পণ্য রপ্তানির বিপরীতে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা পাবে। গত অর্থবছরের মতো এবারও ১ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা প্রযোজ্য থাকছে। চলতি অর্থবছরে ১০০ শতাংশ হালাল মাংসের সঙ্গে ১০০ শতাংশ হালাল উপায়ে প্রক্রিয়াকৃত মাংসজাত পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দেওয়া হবে। সফটওয়্যার ও আইটিএস সেবা রপ্তানির বিপরীতে ব্যক্তি পর্যায়ে ফ্রিল্যান্সারেরা ৪ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা পাবেন।

ইপিজেডে রেকর্ড বিনিয়োগ

গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ

এলাকাগুলোতে (ইপিজেড) বিনিয়োগে নতুন রেকর্ড হয়েছে। ওই অর্থবছরে ৪০ কোটি ৯৮ লাখ ডলারের বিনিয়োগ এসেছে ইপিজেডগুলোতে, যা কোনো একক অর্থবছর হিসেবে এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ হয়েছিল ৪০ কোটি ৬৪ লাখ ডলার। গত অর্থবছরে ইপিজেডে আসা বিনিয়োগ আগের অর্থবছরের তুলনায় ২০ দশমিক ২৬ শতাংশ বেশি। এছাড়া গত অর্থবছরে দেশের আট ইপিজেড থেকে রপ্তানিও সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ৮৬৫ কোটি ৫৯ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় হয়েছে গত অর্থবছরে। এটি আগের অর্থবছরের তুলনায় ৩০ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি। এর আগে সর্বোচ্চ রপ্তানি ছিল ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে। ওই অর্থবছরে ৭৫২ কোটি ৪১ লাখ ডলারের রপ্তানি আয় করে ইপিজেডের প্রতিষ্ঠানগুলো। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২২ ঢাকায় তথ্য ভবনে 'জনতার সরকার সিটিজেন ইন্টারেক্টিভ ওয়েব পোর্টাল'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতা করেন। এসময় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

ডিজিটাল বাংলাদেশ

সারা দেশে ৫৫৫টি জয় ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার নির্মাণ করা হবে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সারা দেশে ৫৫৫টি জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এরই মধ্যে এ সেন্টার নির্মাণ কার্যক্রমকে অনুমোদন করেছেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর নাটোরের সিংড়া উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ডিজিটাল পরিচয়পত্র এবং সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বলেন, জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে তরুণ-তরুণীরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ই-কমার্স উদ্যোক্তা, আইটি ফ্রিল্যান্সার, এন্টারপ্রেনার এবং মন্ত্রণালয়গুলোর সরকারি সেবা পেতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সল্যুশন সেন্টার হিসেবে কাজ করবে। সব জেলায় শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। ১৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে তথ্যপ্রযুক্তির শিক্ষা গ্রহণ করছে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সততা, সাহসিকতা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের পরিচিতিকে আমরা শ্রমভিত্তিক অর্থনীতির দেশ থেকে প্রযুক্তিনির্ভর মেধাবী জাতি হিসেবে পরিচিত করতে চাই।

সাইবার সুরক্ষায় নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, সাইবার সুরক্ষায় বিশ্বে নেতৃত্বে যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গে মিলে আমরা সাইবার সেন্টার ফর এক্সিলেন্স গড়ে তুলব। এসব উদ্যোগ আমাদের দেশে অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ২রা সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের নিউপোর্ট ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে বিশ্বনন্দিত কমিউনিটি ইন্টারেস্ট কোম্পানি 'সাইবার ওয়েলস'-এর কো-ফাউন্ডার ও চেয়ারম্যান কর্নেল জন ডেভিস এমবিই এবং প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাইবার জগতে নেতৃত্ব দিতে 'সাইবার সেন্টার ফর এক্সিলেন্স' উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ। এরই অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ডিজিটাল সংহতি আরও সুদৃঢ় করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ক্রমবর্ধমান সাইবার নিরাপত্তা মোকাবিলা করা একা কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। আইসিটি বিভাগের বিজিডি ই-গভর্নমেন্ট সার্ট বাংলাদেশে সাইবার সর্বোত্তম অনুশীলন নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে যুক্তরাজ্যের সাইবার ওয়েলসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

অর্থনীতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা দেখছেন ব্যবসায়ীরা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদার ভারত। নানা প্রতিকূলতার পরও দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য গত এক দশকে জোরদার হয়েছে। ভারতের সেভেন সিস্টার্সে বাংলাদেশের জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রীর সফরে ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য উন্নয়নে ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চার দিনের ভারত সফরের ফলে বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদে অংশীদারি বাণিজ্যের পথ আরও উন্মুক্ত হয় বলে আশা দেশের ব্যবসায়ীদের। প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের ৬২ জন প্রতিনিধি।

এফবিসিসিআইয়ের তথ্যানুসারে, ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ভারতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে ৫৩০ কোটি ডলারের পণ্য। আর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে দুই দেশের বাণিজ্য হয় এক হাজার ৫৯৩ কোটি ডলার।

বর্তমানে সাফটা ও বিমসটেক চুক্তির মাধ্যমে ভারতে শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতায় রপ্তানির সুযোগ পাচ্ছে বাংলাদেশ। তবে ব্যাবসায় বিনিয়োগের পরিধি বাড়াতে সেপা চুক্তির বিষয়ে পর্যালোচনা হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। প্রধানমন্ত্রীর সফরে এ বিষয়েও অগ্রগতি এসেছে। দ্বিপক্ষীয় এই চুক্তি নিয়ে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, সেপা চুক্তি করা হলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রবৃদ্ধি ১.৭২ শতাংশ বেশি হবে। ভারতের বাড়বে দশমিক শূন্য তিন শতাংশ হারে। এছাড়া চুক্তির ফলে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন নন-ট্যারিফ ও প্যারা-ট্যারিফ প্রত্যাহার হবে। ফলে ভারতে রপ্তানি সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ বাড়বে।

বাজারে আসছে ১০ ও ২০ টাকার নতুন নোট

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদারের স্বাক্ষর করা ১০ ও ২০ টাকার নতুন নোট বাজারে আসছে। ১৫ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মতিঝিল থেকে এই নোট দুটি ইস্যু করা হবে, পরে অন্যান্য শাখা থেকেও বাজারে ছাড়া হবে। ১৪ই সেপ্টেম্বর এ তথ্য নিশ্চিত করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১০ ও ২০ টাকার নতুন নোটের সার্কুলেশন দেওয়া হবে। বর্তমানে প্রচলিত নোটের সব কিছুই একই থাকবে, শুধু স্বাক্ষরটা নতুন গভর্নর মহোদয়ের থাকবে। অর্থাৎ নতুন মুদ্রিত নোটের রং, আকৃতি, ডিজাইন ও সব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের মতোই থাকবে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

গোল্ডেন বুট এবং সেরা খেলোয়াড়ের ট্রফি সাবিনার

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি আর সেরা খেলোয়াড়ের পাশাপাশি বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের হাতে উঠেছে টুর্নামেন্টের সেরা গোলদাতার গোল্ডেন বুটও। এবারে সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের পুরো টুর্নামেন্টে দুই হ্যাটট্রিকসহ ৮টি গোল করেন সাবিনা। শুধু যে সাবিনা গোল করেছেন তা নয়, গোল করিয়েছেনও সতীর্থদের দিয়ে।

১৯শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শিরোপা জিতার পেছনে সবচেয়ে বড়ো কুশীলব হিসেবে কাজ করেছেন গোল্ডেন গার্ল সাবিনা। মালদ্বীপের বিপক্ষে জোড়া গোল দিয়ে শুরু, তারপর পাকিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক। সেমিফাইনালে ভুটানের বিপক্ষেও হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। ফাইনালে নেপালের বিপক্ষে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং দ্বিতীয় গোলটি হয়েছে তারই সহায়তায়। তাই নেপালে অনুষ্ঠিত এবারের সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে শুধু চ্যাম্পিয়নের ট্রফি নয়, সাবিনা পেয়েছেন সেরা গোলদাতার জন্য গোল্ডেন বুট এবং তার সাথে সেরা খেলোয়াড়ের মর্যাদা।

ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড পেলেন আনুশা চৌধুরী

মানুষের জীবনমান উন্নত করতে যেসব তরুণ-তরুণী কাজ করেন তাদের মধ্য থেকে এবার আটজনকে দেওয়া হয়েছে 'ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড'। সেই আটজনের একজন হলেন আনুশা চৌধুরী, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের (সিইউবি) এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের ডিরেক্টর, যিনি এ পুরস্কার পেলেন।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৮ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন লেটস টক মেন্টাল হেলথ নামের একটি সেবামূলক সংগঠন। তার একান্ত প্রচেষ্টায় দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে সংগঠনটি। মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তার এই অসামান্য অবদানের জন্য এবছর তিনি ভূষিত হয়েছেন সম্মানজনক ডায়ানা অ্যাওয়ার্ডে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

টিসিবির পণ্য পাচ্ছে কোটি পরিবার

রাজধানীসহ সারা দেশে ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে কম মূল্যে পণ্য বিক্রি শুরু করেছে সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। প্রতি মাসে একবার করে কার্ডধারীদের মধ্যে এই পণ্য দেওয়া হবে। ঢাকার বাইরে ১১ই সেপ্টেম্বর রংপুর নগরের কেরানীপাড়ায় টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। ঢাকায় এ কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব তপন কান্তি ঘোষ।

প্রতি কার্ডধারী পরিবার মাসে ১১০ টাকা লিটার দরে দুই লিটার তেল, ৬৫ টাকা কেজি দরে দুই কেজি মসুর ডাল, ৫৫ টাকা কেজি দরে এক কেজি চিনি কিনতে পারবে, যার প্যাকেজ মূল্য হচ্ছে ৪০৫ টাকা। এছাড়া পেঁয়াজ দেশের বাইরে থেকে আসা সাপেক্ষে মহানগরগুলোতে বিক্রি করা হবে। এ কার্যক্রমের উদ্‌বোধনকালে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, দেশের কোনো মানুষ যেন অনাহারে না থাকে, সেজন্য টিসিবি এবং ওএমএসের মাধ্যমে সরকার সুলভমূল্যে খাদ্য সহায়তা দিচ্ছে। যতদিন প্রয়োজন হবে, ততদিন এই কার্যক্রম চলবে।

ঢাকায় কার্যক্রম উদ্‌বোধন শেষে জ্যেষ্ঠ সচিব তপন কান্তি ঘোষ বলেন, টিসিবির এ উদ্যোগে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ উপকৃত হচ্ছে। প্রতি মাসেই এ পণ্য দেওয়া হবে। মাসে একবার করে পণ্য দিতে গিয়ে বছরে সরকারকে প্রায় পাঁচ হাজার ২০০ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে হবে। এর পরও মাসে দুইবার এই পণ্য দেওয়া যায় কি না, সেটা মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

সারা দেশে মাশরুম চাষের উদ্যোগ

বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার যেসব উপজেলায় মাশরুম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে এমন ১৬০টি উপজেলা ও ১৫টি মেট্রোপলিটন থানায় 'মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' প্রকল্পের আওতায় মাশরুম চাষের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এ কাজে ৯৮ কোটি ৩৪ লাখ ১১ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে। জুলাই ২০২২ থেকে জুন ২০২৭ মেয়াদে এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক ১২ই অক্টোবর ২০২২ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ১০টি ক্যাটাগরিতে ৪৪ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৫ ও ১৪২৬' বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন– পিআইডি

বিভিন্ন প্রকার মাশরুমের ২৫টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে চাষ ও সংরক্ষণ উপযোগী ২০টি টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। উচ্চ মানসম্পন্ন মাশরুম ও মাশরুমজাত পণ্য উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, ৮০০ জন মাশরুম শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। ৯৫টি ছাদ প্রদর্শনী, ৮০০টি স্পন ও মাশরুম উৎপাদন প্রদর্শনী স্থাপন, ৬০০ বর্গমিটার ডরমেটরি ভবন এক্সটেনশন, ৪৫০ বর্গমিটার ল্যাবরেটরি কাম অফিস ভবন এক্সটেনশন, ৯৫০ বর্গমিটার ওয়ার্কশপ কাম ল্যাবরেটরি ভবন, ১টি ইনকিউবেশন রুম, ৩৫টি ভার্মি কম্পোস্ট ইউনিট নির্মাণ করা হবে।

মাশরুম একটি পুষ্টিকর , সুস্বাদু ও ঔষধি গুণসম্পন্ন খাবার, যা চাষের জন্য আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না। হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং উচ্চবিত্ত জনগণের কাছে মাশরুমের পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের মাশরুম চাষে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

আলু সংরক্ষণে ৭৬টি উপজেলায় ৪৫০টি মডেল ঘর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) আলু সংরক্ষণে মডেল ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। চাষিদের বসতবাড়ির উঁচু, খোলা ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে বাঁশ, কাঠ, টিন, ইটের গাঁথুনি ও আরসিসি পিলারে নির্মিত হবে এ ঘর। এ লক্ষ্যে একটি প্রকল্পও অনুমোদন করেছে সরকার।

'আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন' শীর্ষক এ প্রকল্পে ব্যয় হবে ৪২ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। প্রকল্প অনুযায়ী দেশের সাত অঞ্চলের ১৭টি জেলার ৭৬টি উপজেলায় ৪৫০টি আলু সংরক্ষণ মডেল ঘর নির্মাণ করা হবে। জানুয়ারি ২০২২ থেকে জুন ২০২৬ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান বলেন, দেশীয় প্রযুক্তিতে বাঁশ, কাঠ, টিন, ইটের গাঁথুনি ও আরসিসি পিলার দিয়ে ৪৫০টি আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি মডেল ঘরকেন্দ্রিক ৩০ জন (কৃষক বিপণন দল) কৃষক সুবিধাভোগী হবেন। এভাবে ৪৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হবে। এর মাধ্যমে আলু চাষিদের বিপণন সক্ষমতা বাড়বে।

তিনি আরও বলেন, ১৮ হাজার ৯০০ কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীকে আলুর বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। রপ্তানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সঙ্গে ৪৫০ জন কৃষক বিপণন দলের সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাও থাকবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে এখন কৃষক পর্যায়ে কমবেশি ৪০ জাতের আলুর চাষ হচ্ছে। বছরে আলুর উৎপাদন প্রায় ৯৭ লাখ মেট্রিক টন। কিন্তু সারা দেশে মোট উৎপাদনের বিপরীতে হিমাগারে সংরক্ষণ সুবিধার পরিমাণ ২৮ দশমিক ১০ লাখ মেট্রিক টনের। পাশাপাশি রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আলু চাষের জন্য প্রসিদ্ধ জেলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। প্রকল্পটি ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া ও জয়পুরহাটে বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

শকুন রক্ষায় বাংলাদেশ এগিয়ে

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশে জাতীয় শকুন সংরক্ষণ কমিটি গঠন, সরকারিভাবে দুটি শকুন নিরাপদ অঞ্চল ঘোষণা এবং দশ বছর (২০১৬-২০২৫) মেয়াদি 'বাংলাদেশ শকুন সংরক্ষণ কর্মপরিকল্পনা' বাংলাদেশ শকুন রক্ষা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি কাঠামো হিসেবে কাজ করছে।

শকুন রক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণে বাংলাদেশ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে। দেশে ২০১০ সালে শকুনের জন্য ক্ষতিকর ওষুধ ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ করা হয়, যা এশিয়ার মধ্যে প্রথম। সরকার কিটোপ্রফেন ক্ষতিকর ওষুধও নিষিদ্ধ করেছে। কিটোপ্রফেন নিষিদ্ধের পর নিরাপদ ওষুধ মেলোক্সিক্যাম ও টলফামেনিক এসিডের ব্যবহার বাড়াতে শুরু করেছে– যা শকুন রক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ ব্যাপারে সব ওষুধ কোম্পানিকে ক্ষতিকর কিটোপ্রফেন উৎপাদন ও বিপণন বন্ধে সরকারি নির্দেশ মেনে চলার আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি আরও

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান ১৩ই অক্টোবর ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০২২' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

বলেন, শকুন সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি বিজ্ঞানভিত্তিক যে-কোনো পরিকল্পনা আমাদের মন্ত্রণালয়ে আসলে তা বাস্তবায়নে সহায়তা করা হবে। আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস ২০২২ উপলক্ষে ৩রা সেপ্টেম্বর বন অধিদপ্তরে আয়োজিত আলোচনাসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শকুনের প্রজনন হার বৃদ্ধি

সারা দেশে শকুনের প্রজনন হার অপরিবর্তিত থাকলেও হবিগঞ্জ জেলার রেমা-কালেঙ্গা বনে প্রজনন হার বেড়েছে। ২০১৪ সালে এ অঞ্চলে প্রজনন হার ছিল ৪৪ শতাংশ, এখন তা ৭১ শতাংশ। শকুন বাঁচাতে সচেতনতা গড়ে তুলতে প্রতিবছর সেপ্টেম্বরের প্রথম শনিবার পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবস'। বন বিভাগের সুফল প্রকল্পের অধীন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার (আইইউসিএন) নামে একটি প্রতিষ্ঠান দেশে ২০১৪ সাল থেকে শকুনের পরিচর্যা নিয়ে কাজ করছে। শকুনের জন্য দুটি স্থানকে নিরাপদ আবাসস্থল বলা হয়। একটি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় অবস্থিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বনাঞ্চল রেমা-কালেঙ্গা এবং অপরটি খুলনার সুন্দরবন।

প্রতিবেদন: সানজিদা আহমেদ

যোগাযোগ ও নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা-বরিশাল থেকে প্রতিদিন ছাড়বে তিনটি করে লঞ্চ

পদ্মা সেতু উদ্‌বোধনের পর বরিশাল-ঢাকা রুটে তিনটি করে লঞ্চ চলবে প্রতিদিন। এজন্য বরিশাল-ঢাকা রুটের সব লঞ্চ নিয়ে করা হয়েছে ছয়টি গ্রুপ। ১৩ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ চলাচল সংস্থার (যাপ) প্রধান কার্যালয়ে সমিতির এক জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় ঢাকা-বরিশাল রুটের ১৮টি লঞ্চকে ছয়টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে 'ক' গ্রুপে এমভি সুন্দরবন-১১, এমভি পারাবত-১১ ও এমভি কীর্তনখোলা-২, 'খ' গ্রুপে এমভি সুরভী-৮, এমভি মানামী ও এমভি অ্যাডভেঞ্চার-৯, 'গ' গ্রুপে এমভি সুন্দরবন-১০, এমভি পারাবত-১২ ও এমভি অ্যাডভেঞ্চার-১, 'ঘ' গ্রুপে এমভি পারাবত-৯, এমভি সুরভী-৭ ও এমভি প্রিন্স আওলাদ-১০, 'ঙ' গ্রুপে এমভি সুন্দরবন-১৬, এমভি কুয়াকাটা-২ ও এমভি পারাবত-১০ এবং 'চ' গ্রুপে এমভি সুরভী-৯, এমভি কীর্তনখোলা-১০ ও এমভি পারাবত-১৮ রয়েছে।

সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঢাকার সদরঘাট থেকে ছেড়ে যাওয়া তিনটি লঞ্চ ভোর ৫টার মধ্যে বরিশাল নদীবন্দরে এবং বরিশাল নদীবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া তিনটি লঞ্চ সকাল ৬টার মধ্যে ঢাকার সদরঘাটে পৌঁছবে। লঞ্চগুলো পথিমধ্যে অসম প্রতিযোগিতা কিংবা কেউ কাউকে ওভারটেকও করতে পারবে না।

সড়কে 'স্মার্ট পার্কিং' চালু

গুলশান-বনানীসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যত্রতত্র পার্ক করা হচ্ছে হাজারো ব্যক্তিগত গাড়ি। এতে সড়কে সৃষ্টি হচ্ছে তীব্র যানজট। এসব গাড়ির বিরুদ্ধে প্রতিদিনই মামলা করছে পুলিশ। এ অবস্থায় গুলশানের নির্দিষ্ট সড়কে 'স্মার্ট পদ্ধতিতে' গাড়ি পার্কিংয়ে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। এই পার্কিং সিস্টেম চালু হলে স্মার্টফোনে অ্যাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পার্কিং খুঁজে পাবেন চালকরা। এসব জায়গায় গাড়ি রাখতে হলে দিতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি। আর ওই সড়কগুলোর বাইরে অন্য কোথাও গাড়ি পার্ক করলে মোটা অঙ্কের জরিমানা করবে ট্রাফিক পুলিশ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডিএনসিসি এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারলে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং বন্ধ হবে। সড়কেও যানজট কিছুটা কমবে। রাজউক যেসব ভবন অনুমোদন দিচ্ছে, সেখানে পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে এই অব্যবস্থাপনা কমবে না। ডিএনসিসির প্রকৌশল বিভাগের ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল সংশ্লিষ্টরা জানান, গুলশানের ৪, ৬২, ৬৩, ১০৩ ও ১০৯–এই পাঁচটি রোডে এসব পার্কিং ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে ডিএনসিসি। তিন মাস মেয়াদি এই প্রকল্প পর্যালোচনা করে পরবর্তী সময়ে শহরের অন্যান্য সড়কে একই রকম উদ্যোগ নেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

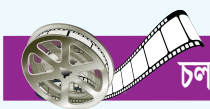

চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পকলা পদক পেলেন গুণীজনেরা

করোনা মহামারির কারণে দুই বছর বন্ধ ছিল শিল্পকলা পদক প্রদান অনুষ্ঠান। অবশেষে ২০১৯ ও ২০২০ সালে শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রাখায় ১৮ জন গুণী শিল্পী ও দুই সংগঠনকে পদক তুলে দেওয়া হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর জাতীয় নাট্যশালার প্রধান মিলনায়তনে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বঙ্গভবন থেকে ভার্চুয়ালি অংশ নেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। এসময় রাষ্ট্রপতির পক্ষে শিল্পীদের হাতে পদক তুলে দেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

২০১৯ সালে শিল্পকলা পদক পেয়েছেন– নাট্যকলায় মাসুদ আলী খান, কণ্ঠসংগীতে হাসিনা মমতাজ, চারুকলায় আবদুল মান্নান, চলচ্চিত্রে অনুপম হায়াৎ, নৃত্যকলায় লুবনা মারিয়াম, লোকসংস্কৃতিতে শম্ভু আচার্য, যন্ত্রসংগীতে মো. মনিরুজ্জামান, আলোকচিত্রে এম এ তাহের, আবৃত্তিতে হাসান আরিফ ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ছায়ানট।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২২ শাহবাগ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এসময় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন– পিআইডি

২০২০ সালে শিল্পকলা পদক পেয়েছেন– নাট্যকলায় মলয় ভৌমিক, কণ্ঠসংগীতে মাহমুদুর রহমান বেণু, চারুকলায় শহীদ কবীর, চলচ্চিত্রে শামীম আখতার, নৃত্যকলায় শিবলী মোহাম্মদ, লোকসংস্কৃতিতে শাহ আলম সরকার, যন্ত্রসংগীতে মো. সামসুর রহমান, আলোকচিত্রে আ ন ম শফিকুল ইসলাম স্বপন, আবৃত্তিতে ডালিয়া আহমেদ ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে দিনাজপুর নাট্য সমিতি।

ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা

কলকাতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব চলচ্চিত্রের আরেকটি আসর। প্রথমবার আয়োজিত এই উৎসবের নাম 'ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কলকাতা', বিশ্বের অসংখ্য ছবি-শিল্পী-কুশলী অংশ নেয় এ উৎসবে। এই ফেস্টিভ্যাল ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । উৎসবের উদ্‌বোধনী দিনে অন্যতম অতিথির আসনে বসেছেন দুই বাংলার অভিনেত্রী জয়া আহসান। এছাড়া ঢাকা থেকে অতিথির আসনে আরও ছিলেন পরিচালক আবু সাইয়িদ ও অভিনেত্রী জ্যোতিকা জ্যোতি। উৎসবের উদ্‌বোধনী দিনে বাংলাদেশের মোহাম্মদ রাব্বি মৃধার *পায়ের তলায় মাটি নাই* প্রদর্শিত হয়। এছাড়া উৎসবের বিভিন্ন বিভাগে প্রদর্শিত হয় নুরুল আলম আতিকের *লাল মোরগের ঝুঁটি*, মাসুদ পথিকের *মায়া*, অমিতাভ রেজার *রিকশা গার্ল* ও সুবর্ণ সেঁজুতি তুষীর স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *রিপলস*।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ইতিহাস তৈরি করলেন সাবিনা খাতুনরা। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে হয় হাইভোল্টেজ এই ফাইনাল ম্যাচটি। ম্যাচের শুরু থেকেই চমৎকার খেলছিলেন মারিয়ারা। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলে ফাইনাল জিতে নেয় বাংলাদেশ। তাই ১৯শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের কাছে এক ঐতিহাসিক দিন। প্রথমবার বাংলাদেশ জিতল মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। অর্জন করল দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবল শ্রেষ্ঠত্ব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্রে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগদান শেষে দেশে ফিরে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী নারী ফুটবলারদের পুরস্কৃত করবেন। ২২শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব হাসান জাহিদ তুষার এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, নারী ফুটবলারদের মধ্যে যাদের ঘর প্রয়োজন, তাদের জন্য ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা করতে ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। চ্যাম্পিয়ন দলের অন্য খেলোয়াড়দের ঘরবাড়ির কী অবস্থা, সে বিষয়েও তিনি সংশ্লিষ্টদের খবর নিতে বলেন।

বড়ো জয় বাংলাদেশের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের বিপক্ষে দাঁড়াতেই পারেনি সংযুক্ত আরব আমিরাত। স্বাগতিকদের তাদের মাটিতেই উড়িয়ে দিয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল। সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৫৪ রানের বড়ো ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ১৬ই সেপ্টেম্বর আবুধাবিতে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১২৪ রান করে বাংলাদেশ।

টি-টোয়েন্টির এক নম্বর অলরাউন্ডার সাকিব

আইসিসির ওয়ানডে অলরাউন্ডারদের তালিকায় আগে থেকেই ছিলেন শীর্ষে। এবার প্রায় এক বছর পর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠলেন সাকিব আল হাসান। র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৫২ রেটিং নিয়ে শীর্ষে ছিলেন নবী। তবে এশিয়া কাপের ব্যর্থতাই তাকে এক ধাপ নীচে নামিয়ে এনেছে। র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি। অন্যদিকে এশিয়া কাপে সাকিব ২ ম্যাচে ব্যাট হাতে ৩৫ রানের পাশাপাশি বল হাতে নিয়েছেন ১ উইকেট। এর আগের প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ের ২৪৮ রেটিং ছিল সাকিবের। নবীর ৬ পয়েন্ট কমলে ২৪৮ রেটিং নিয়েই শীর্ষস্থানে উঠেছেন সাকিব।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

চলে গেলেন ভাষাসৈনিক ও সাংবাদিক রণেশ মৈত্র

আফরোজা রুমা

বীর মুক্তিযোদ্ধা, ভাষাসৈনিক, একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রবীণ সাংবাদিক, কলামিস্ট ও পাবনা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক রণেশ মৈত্র চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২৬শে সেপ্টেম্বর ঢাকার পপুলার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

রণেশ মৈত্র ১৯৩৩ সালের ৪ঠা অক্টোবর রাজশাহী জেলার নহাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক বাসস্থান পাবনা জেলার ভুলবাড়িয়া গ্রামে। বাবা রমেশ চন্দ্র ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার পর থেকেই রণেশ মৈত্র টিউশনি করে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালাতেন। ১৯৫০ সালে পাবনা জিসিআই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫৫ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯৫৯ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৫১ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *নওবেলাল* পত্রিকায় সাংবাদিকতার মাধ্যমেই তাঁর সাংবাদিকতা জীবন শুরু। এরপর কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক সত্যযুগ*-এ তিন বছর সাংবাদিকতার পর ১৯৫৫ সালে তিনি যোগ দেন *দৈনিক সংবাদ*-এ। ১৯৬১ সালে *ডেইলি মর্নিং নিউজ* এবং ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত *দৈনিক অবজারভার*-এ পাবনা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালে *দি নিউ নেশন*-এর মফস্বল সম্পাদক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত *দি ডেইলি স্টার*-এর পাবনা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি নিয়ে একজন ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে দেশের শীর্ষ পত্রপত্রিকায় কলাম লিখে সারা দেশে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তাঁর নিজ জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়েই দেশের অসহায়, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করেন। ১৯৬১ সালে পাবনায় পূর্ব পাকিস্তান মফস্বল সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সম্মেলনের মাধ্যমে মফস্বল সাংবাদিকরা তাঁদের পেশার স্বীকৃতি পান। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত পাবনা প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন রণেশ মৈত্র।

১৯৪৮ সালে ছাত্র ইউনিয়ন থেকে ভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দেওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় রণেশ মৈত্র'র রাজনৈতিক জীবন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেলও খেটেছেন তিনি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে তিনি পাবনা জেলার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। সে বছরই ছাত্র ইউনিয়নের জেলা সভাপতি ও ১৯৫৩ সালে এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রসংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি *দৈনিক অবজারভার*-এর আবদুল মতিন, কামাল লোহানীসহ প্রগতিশীল বন্ধুদের সঙ্গে গঠন করেন 'শিখা সংঘ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। ভাষা আন্দোলন, ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনসহ পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় রণেশ মৈত্র বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৫৫ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। তবে ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপে ও ১৯৬৭ সালে মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপে যোগ দেন। দীর্ঘদিন ন্যাপের প্রেসিডিয়াম সদস্যসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি 'ঐক্য ন্যাপ'-এর প্রেসিডিয়াম সদস্য ও পাবনা জেলা সভাপতি ছিলেন। কর্মজীবনে সফল আইনজীবী হিসেবেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করে সেখান থেকেও স্বেচ্ছায় অবসর নেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে জেলার সাংবাদিকদের নেতৃত্ব দেন। রণেশ মৈত্রের প্রকাশিত গ্রন্থ– *বাংলাদেশ কোন পথে?* (২০২০), *আত্মজীবনী* (২০২১), *প্রবন্ধসংগ্রহ* (২০২১), *রুদ্র চৈতন্যে বিপন্ন বাংলাদেশ* পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হয়। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য রণেশ মৈত্র ২০১৮ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। তিনি মফস্বল সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান রাখায় 'বসুন্ধরা মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন।

ভাষাসংগ্রামী, মহান মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও কলামিস্ট রণেশ মৈত্র'র মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঐদিন বেলা দুইটায় সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য প্রয়াত রণেশ মৈত্র'র মরদেহ পাবনার বীর মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম বকুল স্বাধীনতা চত্বরে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মানসূচক গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। ভাষাসৈনিক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক রণেশ মৈত্রর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পাবনা মহাশ্মশানে সম্পন্ন হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ পত্রিকায় লেখা পাঠানোর নিয়মাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রকাশনা *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকায় দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি-সাফল্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য যে-কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার, গল্প, কবিতা/ছড়া, গ্রন্থালোচনা, ভ্রমণ কাহিনি ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা পাঠানো যায়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত লেখা সংশোধন ও সম্পাদনান্তে প্রকাশিত হয়। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা প্রকাশিত হলে সৌজন্য কপি এবং বিধি অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হয়। লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণীয়:

- মৌলিক লেখা পাঠাতে হবে। প্রকাশিত লেখা বা অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রদত্ত লেখা পাঠানো যাবে না।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার ও গল্প সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনূর্ধ্ব দেড় হাজার শব্দ। ন্যূনতম এক হাজার শব্দ হতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে দুই হাজার বা ততোধিক শব্দ গ্রহণযোগ্য। লেখার সঙ্গে মানসম্মত চিত্র (ক্যাপশনসহ) গৃহীত হবে।
- ১৪-২০ পঙ্‌ক্তি/লাইনের কবিতা/ছড়া হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কম/বেশি লাইনসংখ্যা গৃহীত হয়। ছন্দবদ্ধ ও নিপুণ অন্ত্যমিলসমৃদ্ধ কবিতা/ছড়ার মনোনয়ন অগ্রাধিকার পাবে। একসঙ্গে কমপক্ষে ৩টি কবিতা/ছড়া পাঠাতে হবে। কবিতা কিংবা ছড়াগুচ্ছ কোন বিভাগের জন্য লেখা– তা স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধ/ফিচার হতে হবে প্রাসঙ্গিক, নির্ভুল, তথ্যসমৃদ্ধ ও মানোন্নত।
- প্রবন্ধ/নিবন্ধের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র আবশ্যক। লেখার সঙ্গে পাদটীকা ও গ্রাফ ইত্যাদি সহায়ক তথ্য থাকলে ভালো হয়।
- লেখার ভাষা সহজ-সরল, পরিশীলিত ও সাবলীল হতে হবে।
- বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানান রীতি মেনে লেখা পাঠাতে হবে।
- বিশেষ দিবস/সংখ্যার লেখার ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩ (তিন) মাস পূর্বে লেখা পাঠাতে হবে।
- মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে সুতনি এমজে (SutonnyMJ) ফন্টে লেখা হতে হবে।
- ইতোমধ্যে প্রকাশিত লেখা/বইয়ের তালিকাসহ সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতি এবং ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, নগদ/বিকাশ নম্বরসহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা আবশ্যক (*সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য)।
- লেখকের পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) কপি, প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় বা কর্মস্থল) পরিচয়পত্রের (আইডি) কপি লেখার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে (প্রতিষ্ঠিত লেখকদের জন্য প্রযোজ্য নয়)।

লেখা হাতে হাতে বা প্রধান সম্পাদক/মহাপরিচালক বরাবর ডাকযোগে অথবা dfpsb1@gmail.com, dfpsb@yahoo.com ই-মেইলে পাঠানোর অনুরোধ করা হলো। যে-কোনো প্রয়োজনে ০২-৮৩০০৬৮৭ (সম্পাদক), ০২-৮৩০০৭০৪ (সিনিয়র সম্পাদক) নম্বর ফোনে যোগাযোগ করা যাবে। লেখা প্রকাশের অনুরোধ বিষয়ক যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়।

সচিত্র বাংলাদেশ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 43, No. 04, October 2022, Tk. 25.00

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd